অজ্ঞাতবাস

শৈবাল মিত্র

নবপত্র প্রকাশন । কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ ১৩৫৯

প্রকাশক ঃ
প্রসন্ন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

বারো টাকা

AGYATABAS
BY
SAIBAL MITRA

মাঝ রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। ধারাল বিটকেল আওয়াজ। তপুর ঘুম এমনিতে পাতলা। আজকাল আরো জলো হয়ে গেছে। শরীরের সুতোগুলো সব সময় টান-টান, সজাগ। প্রথম চোটেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। চমকে ওঠে। কাঠের দরজায় ভারী পায়ের লাথি পড়ে। তপু জানত এটা হবে। পুলিশ আসবে। তৈরি ছিল সে। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবিটা পরে। পালাতে হবে। দোতলার অন্ধকার বারান্দা দিয়ে পাশের বাড়ির কার্নিশে নামে। এখান দিয়ে বাড়ির পেছনে বড় রাস্তায় আসা যায়। বাড়ির সদর দরজা গলির ওপর। সেখান থেকে এ-রাস্তার হদিশ মেলে না।

অন্ধকার কার্নিশে দাঁড়িয়ে ও কপালের ঘাম মোছে। ঢিপ-ঢিপ করে বুক। পুলিশের সঙ্গে বাবার কথাবার্তা শুনতে পায়।

'দরজা খুলুন। না হলে ভেঙ্গে ফেলবো।'

'কি ব্যাপার ?'

'তপেশ গুহর নামে এ্যারেস্ট ওয়ারেণ্ট আছে।'

বাড়ির মধ্যে কয়েকটা আলো জ্বলেছে। ফিকে আলো কার্নিশ প্রায় ছুঁয়ে ফেলছে। চারপাশ অন্ধকার। এতোক্ষণ ঘুম, নীরবতায় ডুবেছিল। হঠাৎ এই বেমক্কা হৈ-চৈ-তে একটু থমকে গেছে। আশ-পাশের বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ নেই। হয়তো অন্ধকারে জানলার ফাঁক দিয়ে কেউ উঁকি মারছে। কেউ ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে বিছানায়। ওঠার সাহস নেই। ফালতু ঝামেলা।

সদর খোলার শব্দ হয়। তপু তাড়াতাড়ি কার্নিশ থেকে পাশের গলিতে নামার জন্যে পা বাড়ায়। ঘুম চোখ। খোলা মাথা। অন্ধকারে ইঁট ভেবে স্রেফ একটা ছায়ার ওপর পা রেখে শরীর ছেড়ে দেয়। শান-বাঁধান গলিতে আছড়ে পড়ে। জোর শব্দ হয়। 'ভাগতা হায়,

ভাগতা হায়'—পুলিশেরা চেঁচায়। তপুকে ওরা দেখতে পায় না। কয়েকটা ভারী পায়ে দৌড়ের শব্দ ওঠে। কানাগলি ছেড়ে ওরা পেছনের বড় রাস্তার দিকে আসছে।

তপু ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। ডান-পায়ের হাঁটুতে চোট লেগেছে। তবু উঠে দাঁড়ায়। কোনমতে বড় রাস্তায় পৌঁছোয়। দুজন পুলিশ তখন এসে গেছে। ইউনিফর্ম পরা একজনের হাতে ঝকমকে রিভলভার।

'হ্যাণ্ডস আপ, নড়লেই গুলি করবো'—সে বলে।

তপু হাত তুলে দাঁড়ায়। শাদা পোশাকের পালোয়ান গোছের সঙ্গীটা এসে তপুকে জাপটে ধরে। পুলিশ দুজনও হাঁপাচ্ছে।

পালোয়ান লোকটা কাঁধের গামছা দিয়ে তপুর দুটো হাত কসে বাঁধে। তারপর টানতে-টানতে নিয়ে যায়। অফিসার একটা যাচ্ছেতাই খিস্তি করে। কিছু পুলিশ তখনও বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। কয়েকজন পড়শীও বেরিয়েছে। তপুকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। পালোয়ান গামছাব একটা খুঁট ধরে থাকে, তপু বুঝতে পারে, আশপাশের বাড়ির মেয়ে-বৌরা অন্ধকার বারান্দা, জানলা দিয়ে তাকে দেখছে। তপু তাকায় না। প্রায় এক-ডজন রাইফেলওলা পুলিশ ওকে মালার মতো ঘিরে ধরে। পালোয়ান গামছা ধরে থাকে। মিছিলটা থানার দিকে এগোয়। ফাঁকা রাস্তা। ফ্যাকাশে আলো। রাতজাগা দু-একটা কুকুর অবাক চোখে দেখে। তপুর ডান হাঁটুটা যন্ত্রণায় টন-টন করে। ও খোঁড়াতে থাকে। থানার বড়বাবুর সামনে ওকে দাঁড় করানো হয়। একজন পুলিশ রসিয়ে-রসিয়ে পালানোর গল্পটা বলে। বড়বাবু হুকুম করে—'লক আপ।'

লক আপে আরও তিনজনকে কিছু আগে ঢোকানো হয়েছে। তপুর চেনা। তারা তপুকে দেখে। দেয়ালে হেলান দিয়ে তপু বসে। হাঁটুটা ফুলেছে। ব্যথায় শরীর কাঁপছে। তপু চোখ বোজে।

লক আপের জানলার পাশে ঝাঁকড়া বকুল গাছ। ফুলের গন্ধ।

পাখিরা আড়মোড়া ভাঙে। ডানা ঝাড়ার শব্দ হয়।

'তপু তোর বাবা এসেছে'—কাজল বলে।

কাজলও ধরা পড়েছে।

তপু তাকায়। সামনে জাল দেওয়া জানলা। বাইরে বকুল গাছের পেছনে লালচে আকাশ। ভোরের রঙ ধরেছে। তপু লক আপের গেটের কাছে বাবাকে দেখে। বৃদ্ধ, রোগা লোকটা ভয় আর ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে। জবুথবু চোখ।

একজন অফিসার বলে—'না, না, ওষুধ-ফষুধ দেওয়ার আইন নেই।'

আর একজন যোগ করে—'যেমন কর্ম, তেমনি ফল। পালাবার মজা বুঝুক।'

বাবা অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে। তপু আবার চোখ বোজে। বেলা বাড়ে। কড়া রোদ। বিষ ব্যথায় চিন্তা চেতনা ঝাপসা হয়ে যায়।

নটা নাগাদ শালপাতায় খানিকটা ভাত, একটু হড়কানি ডাল আর ঘ্যাঁট আসে। তপু ছোঁয় না। তার মুখে কোনো স্বাদ নেই।

কয়েদীরা এখন কোর্টে যাবে। লক আপের ভেতর থেকে আরও দু-বার সে বাবা আর অনুকে দেখেছে। অনু ওর ছোট ভাই। ওর চোখের দৃষ্টি এখন জড়িয়ে আছে। বাবাকে ভাইকে কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে।

লক আপের পেছনের জাল লাগান জানলার গর্তে কে যেন একটা কাগজের গুলি বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দেয়। কাজল তুলে আনে। তপুর ওষুধ—ও ফিস-ফিস করে। চায়ের ভাঁড়ে কল থেকে জল বোঝাই করে। ওষুধটা এগিয়ে দেয়। তপুর দেখার সাধ্য নেই। কোনমতে সেটাকে পেটে চালান করে।

কাজল আর পল্টুর কাঁধে ভর দিয়ে ও পুলিশের ভ্যানে ওঠে। তখন রোদে তেতে উঠেছে চারপাশ। বকুল গাছের পাতায় ঘাম। পাঁচিলের ওপর দুটো কাক রোদে ভাজা হচ্ছে। হাঁটুর ব্যথাটা একটু কম। অসাড় ভাব।

প্রথমে লালবাজার। কাজল আর পল্টু প্রায় কোলে নিয়ে ওকে লাল বাড়িটায় তোলে। সিঁড়ি ভাঙার সময় হাঁটুর ভাঁজ থেকে পা খসে যায়। একটা ঘরে গলায় নম্বর ঝুলিয়ে ওর ফটো তোলা হয়। তারপর কাজল, পল্টু—এক-এক করে সকলের। ঘরের বাইরে টানা বারান্দা। বেঞ্চে অনেক সময় ওরা বসে থাকে। তারপর আবার একতলায়। পাশে একটা হলদে রংয়ের বাড়ি। সেখানে দোতলায় কালিতে হাত-পা ডুবিয়ে ছাপ নেওয়া হয়। বাইরে রাস্তায় ট্রামের ঘণ্টা, মানুষের চলাফেরা, কথার শব্দ। তার পাশে থমথমে এই অদ্ভুত বাড়িটা। দুটো আলাদা পৃথিবী।

তপুর শরীরে কষ্টটা বাড়ে। শিরা স্নায়ুগুলো দপ-দপ করে। তেষ্টায় গলা কাঠ-কাঠ। একজন সিপাইয়ের কাছে জল চায়। সে আর একজনকে বলে। শাদা পোশাকের লোকটা জল আনতে যায়। ফেরে না।

তপুর মাথায় একটা আধফোটা প্রশ্ন জেগে থাকে। আমি পালাতে গেলুম কেন, পালাবার কি দরকার ছিল? তখনই মনে পড়ে পার্টির নির্দেশের কথা। পার্টি বলেছে; জেলে বসে খেয়ে-দেয়ে খোদার খাসি হওয়ার যুগ এটা নয়। বাইরে থাকতে হবে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করতে হবে। গ্রেপ্তার এড়াতে হবে। তপু সবটা বোঝে নি। শলা-পরামর্শ, আলাপ-আলোচনা থেকে ধরতে পেরেছে, মামুলী ছকের বাইরে নতুন কিছু একটা হতে চলেছে। যেটা আগে হয়নি। আগামী দিনগুলো একটা সুখের হবে না। তপু ভয় পায় নি। তবে কয়েকটা ব্যাপারে ধাঁধা থেকে গেছে। হাজার-হাজার মানুষের সভা-সমিতি সংগঠন আর নয়। সব কিছু লুকিয়ে, গোপনে করতে হবে। কেন? এত লুকোচুরি কি দরকার? এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে মানুষ ভুল বুঝবে না? ভুলে যাবে না তো? বিচ্ছিন্নতায়, একাকীত্বে ওর বড় ভয়। মানুষের সঙ্গে না থাকলে মানুষ যে ভুলে যায়। ভুল বোঝে।

কাজল বলে—'ওঠ্, যেতে হবে।'

তপু দাঁড়ায়। ডান পাটা কাঁপতে থাকে। তেষ্টায় গলা জ্বলে। ও বলে—'একটু জল।'

একজন পুলিশের সঙ্গে কোনমতে ও একটা বাথরুমে আসে। কল খুলে জল খায়। গরম জল। আরাম হয় না।

কোর্ট ঘরের একতলায় হাজত। এক টুকরো অন্ধকার ঘরে কয়েকশো আসামী। ঘরের মধ্যেই পেচ্ছাপ-পায়খানার জায়গা। পাশে জলের কল। সরু সুতোয় জল পড়ছে। আঁজলা ভরে জল খাচ্ছে কেউ। বেশির ভাগের রুক্ষ চুল, লাল চোখ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ময়লা জামা-কাপড়। দেখেই মনে হয়,বজ্জাতি এদের পেশা। তারা চেঁচাচ্ছে। খিস্তি করছে। সেই অন্ধকার, অচেনা ঘরের এক কোণে কাজল বসিয়ে দেয় তপুকে। পাগলাটে চেহারার এক ছোকরা সেখানে বসে হাপুস-হাপুস কাঁদছে। খালি গা, কালো হাফ-প্যান্ট। মাথায় লম্বা-লম্বা লালচে চুল। একটা ব্লেড দিয়ে সে হাতের চামড়া কেটে উল্কি বানাচ্ছিল। উল্কিটা শেষ হয়। রক্তে দগদগ করে লেখাটা। তপুকে সে জিজ্ঞেস করে—'কি লিখলুম বলুন তো?'

তপু পড়ে—দুটো অক্ষর, উমা। তপুর গা শির-শির করে। ছেলেটা লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপব আবার গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেয়। 'আমি চুরি করি। আমায় শালারা মার্ডার কেস দিয়েছে'—ও বলে। কাঁদতে-কাঁদতেই ও কথাগুলো বলে যায়। ছেলেটার নাম—মালাকার। বাবা-মা মরে গেছে। সাত কুলে কেউ নেই। উমা ওর প্রেমিকা। কাল উমার বিয়ে। মালাকার এক লাফে লোহার গরাদের কাছে যায়। তারপর শুরু করে কাঁচা খিস্তি। পুলিশের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়।

দিন গড়িয়ে যায়। ছায়া নামে। তপুর শরীর মনে এখন কোনো সাড়া নেই। কেমন একটা বোবা-বোবা ভাব। ফাঁকাও নয়। ভর্তিও নয়।

এক-একটা দল তিনতলায় কোর্ট ঘরে যায়। ফিরে আসে।

কেউ আছে মাসের পর মাস। বছরও ঘুরেছে অনেকের। কারও সময়ের হিসেব নেই।

তপুদের ডাক পড়ে সব শেষে। মইয়ের মতো খাড়াই সিঁড়ি। ওঠার সময় আবার কষ্ট। এক-পায়ে ল্যাংচায়। হাঁটু থেকে ডান-পাটা ঝুলতে থাকে। কাঠগড়ায় ওরা পাঁচজন দাঁড়ায়। কোর্টের ভিড়ে তপু দেখে ওর বাবা, ভাই। ম্যাজিস্ট্রেট তাকায় না। কাগজে মুখ গুঁজে খস-খস করে কি লেখে। কোর্ট ইন্সপেক্টর সেটা পড়ে। তপু বোঝে না। কাজলের মুখে শোনে—তপু ছাড়া বাকি চারজনের জামিন হয়েছে।

কাজল, পল্টুরা মুখ কালো করে চলে যায়। তপুকে নিয়ে ছুজন সেপাই ভ্যানে তোলে। তখন সন্ধ্যে নেমেছে। আকাশে কালো মেঘ। বাইরের নিম গাছটার শরীর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বেরোচ্ছে। আবার লালবাজার। একজন পুলিশ ওকে টেনে-হিঁচড়ে তিনতলায় তোলে। বারান্দায় সেই বেঞ্চটার ওপর ও বসে। তখন তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। মাঝে-মাঝে বিছ্যুতের হলদে আলোয় সামনের ঘরের সাইনবোর্ডটা ঝলসে ওঠে—ক্রিমিন্যাল রেকর্ড সেকশন। 'আমি কি ক্রিমিন্যাল হয়ে গেলুম'—তপু ভাবে। ভেবে কুল পায় না। সে ধরনের কোনো অপরাধের কথা ওর মনে পড়ে না। তবে পালাতে গেলুম কেন? বরেনদার কথাগুলো মনে পড়ে। বরেনদা পার্টির ওপর মহলের নেতা। একটা সভায় বলল—'মনে রেখো, আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি। যুদ্ধের মাঠে কেউ কাউকে খাতির করে না। শত্রু তোমায় ছাড়বে না।' সেটাই শেষ বৈঠক। বরেনদার সঙ্গে তারপর আর দেখা হয় নি।

তপু বুঝেছিল, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে, কোথায় ধরতে পারে নি। লোকজন দিব্যি অফিস-বাজারে যায়। সিনেমায় লাইন মারে। ঘুরে বেড়ায়। চোখে-মুখে খুশি ঠিকরোয়। শুধু ও নিজের মধ্যে একটা বুকচাপা যুদ্ধের হাওয়া নিয়ে হাঁসফাঁস করে। কিছু মানুষ ঝাণ্ডা কাঁধে মিছিলে, সভায় যায়। তারাও কেমন

নির্বিকার। তপুদের যুদ্ধের সঙ্গে যেন কেউ নেই। অনেকে ওর কথা শুনে অবাক হয়। কাছে ঘেঁসে না। দু-একজন যারা উৎসাহ পায় তারাও দেখা করার দিন ঠিক করে উধাও হয়। ফেরে না। তপু বোঝে ও একা হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে।

একটা ধারালো আলোর তীর ছুটে যায়। বারান্দার ওপাশে বিকট শব্দে বাজ পড়ে। নিচে রাস্তার দু-পাশে জল জমেছে। ট্রাম বন্ধ। বাস, মোটরের ভিড় পাতলা। অপু যে কতোক্ষণ এখানে বসে আছে বুঝতে পারে না। কাল মাঝ রাতে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা যেন অনেক দিন আগের ফিকে স্মৃতি। তারপর বহু বছর ঘুরে গেছে। তবু ছাড়া পায় নি। ছুটি মেলে নি। ওর ভীষণ শুতে ইচ্ছে করে। হাত-পা ছড়িয়ে সটান শোয়ার দারুণ মজা। কিন্তু কেউ ওকে ডাকে না। কেন যে বসিয়ে রেখেছে সেটা জানায় না। হাঁটু ফুলে ঢোল। ও হাঁটুতে হাত বুলোয়। চারপাশ নিঝুম, চুপচাপ।

জাহাজের গম্ভীর ভোঁ বাজে। একবার। দু-বার। বলে—অনেক দূর। অনেক দূর।

আরো অনেকক্ষণ বাদে একজন লোক তপুকে ডাকে। তার সঙ্গে ও দরজা পেরিয়ে একটা বড়ো ঘরে ঢোকে। ঘরের মধ্যে টেবিল। জনাতিনেক হোমরাচোমরা অফিসার। তারা তপুকে খুঁটিয়ে দেখে।

'বিজন কোথায়'—জিজ্ঞেস করে একজন।

তপু বলে—'জানি না। দেখা হয় না ওর সঙ্গে।'

'ডাব পট্টিতে বসে পরশু দিন আড্ডা মেরেছো। খবর আছে।' আর একজন জানায়।

তপু অবাক হয়। গত এক মাসে ও ডাব পট্টি মাড়ায় নি।

'পালাচ্ছিলে কেন?'

প্রশ্নটা শুনে তপু চমকে ওঠে। সারাদিনে কয়েক হাজারবার ও নিজেকে আজ জিজ্ঞেস করেছে এ-কথা। জবাব পায় নি। নিজের ভেতরটা ও ঢুঁড়ে ফেলে। কাজ হয় না। আরো কিছু গোলমাল

পাকানো প্রশ্ন জেগে ওঠে।

এগুলো ওকে খোঁচাতো। ও পাত্তা দেয় নি। পায়ের তলায় চেপে রেখেছিল। তপু বোঝে, শুধু পুলিশ নয়, নিজের কাছ থেকেও ও পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।

'যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাই না'—একজন অফিসার গর্জন করে। 'লড়াইয়ে পরোয়া নেই। তোমরা আমাদের একটা করে আঙুল কাটবে। আমরা তোমাদের কব্জি থেকে বাদ দিয়ে দেবো।'

'বরেন কোথায়?'

'জানি না।'

'শুয়োরের বাচ্চা। বিপ্লব···ঢুকিয়ে দেবো।'

তপু ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পায় না। ফেলে দেওয়া প্রশ্নগুলো সব ওকে খোঁচাতে থাকে। আমি পালালুম কেন এই কথাটা বড়ো বেশি উৎপাত করে।

লক আপের তিনতলায় একটা ঘরে তপুর চারদিন কেটে যায়। বাবা মধ্যে একদিন দেখা করতে এসেছিল। কথা হয়েছে কম। দুজনে চুপচাপ বসে ছিল। অপুর জন্যে বাবা একটা পায়জামা পাঞ্জাবি এনেছিল। দিতে পারে নি। কোর্টের হুকুম ছাড়া দেওয়া যাবে না। বাবা দু-চারবার হাত জুড়ে অনুরোধ করেছিল। ধমকানিতে চুপ হয়ে যায়। লক আপের ডাক্তার পায়ের জন্যে একটা লাল মালিশ দিয়েছিল। দু-দিন লাগিয়েছে। তারপর ছোঁয় নি। দিনরাত কাঁটা-ওঠা কম্বলে শুয়ে কেটে যায়। সময়ের চেহারা থাকে না। মাপও নয়। ঘরটার মধ্যে সকালে একটু রোদ আসে। তারপর সন্ধ্যে। অনেকটা সময় থাকে। কল আছে। জল আছে। কিন্তু চান করা হয় না। গামছা নেই। দ্বিতীয় পোশাক নেই। দাঁত মাজা হয় না। মাজন নেই। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গজায়। দেওয়ালের গায়ে লোহার শিক দেওয়া

ছোট জানলাটা দিয়ে বাইরের জ্বলজ্বলে আলো দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে লাল হয় তপুর চোখ। তপুর মাথায় চিন্তাগুলো কিলবিল করে। যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, আত্মত্যাগ কথাগুলো নিয়ে ও ভাবে। যুদ্ধ চলছে। কিন্তু সকলে কি একভাবে যুদ্ধ করবে? সকলে কি হাতে রক্ত মাখবে? বরেনদা বলেছে—'মানুষকে জাগাতে হবে, ঝড় তোলো। বীরের মতো লড়ে যাও। ছেঁদো যুক্তি-তর্কে শত্রুরা তোমায় জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করবে। কান দিও না। অবশ্য যারা কেটে পড়তে চায় তারাও শত্রুর যুক্তিগুলিকে প্রচার করবে। কিন্তু তারা ধরা পড়বে। তারা পালাবে। পালাবার জন্যে নানা অজুহাত খাড়া করবে। তাদের ওপর নজর রেখো।'

তপুর সব গুলিয়ে যায়। ও কি ভয় পেয়েছে? পালাতে চায়? মোটেই নয়। কিন্তু বার-বার মনে হয় এ-সব কথাগুলোর ঠিকমতো জবাব পাওয়া দরকার। রাতে ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখে। বেশির ভাগ পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরির স্বপ্ন। ও পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ তাড়া করছে। ও আত্মগোপন করেছে। পুলিশ খুঁজছে। পাহাড়ের চুড়োয় শেষ প্রান্তে ও কোণঠাসা। পেছনে অন্ধকার, গভীর খাদ। ও পড়ে যাচ্ছে। একটা ফাঁকা পোড়ো বাড়িতে ও বসে আছে। বাড়িটা পুলিশ ঘিরেছে। পালাবার রাস্তা বন্ধ। ঘুমের মধ্যে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কপালে, বুকে ঘাম। গলা শুকনো।

সব দেখেই ও রাজনীতিতে এসেছে। এ-রাজনীতিতে অনেক বিপদ। প্রতিপদে মৃত্যুর হাঁ মুখ। মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে। এখানে থাকলে কোনোদিন এম. এল. এ বা মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নেই। তপু এ-সব ভাবে নি। জীবন-মৃত্যুর পরোয়া করে নি। লড়তে হবে। একটা নতুন দেশ চাই। জন্মভূমি শব্দটা যেখানে মন্ত্রের মতো শুনতে লাগবে।

স্কুলে ইতিহাসের স্যার ছিল যতীশ সরকার। রোগা ক্ষয়া চেহারা।

মুখে অনেক দুর্যোগের চিহ্ন। কাঁচা-পাকা চুল। যতীশবাবু চট্টগ্রামের বিপ্লবী। গার্নারি লুটের দলে ছিল। কালাপানি খেটেছে। যতীশ-বাবুর কাছে ওর হাতেখড়ি। এমনিতে চুপচাপ, গম্ভীর লোক। ফ্যাঁসফেঁসে গলা। নিচু স্বরে অনেক কথা যতীশবাবু শোনাতো। দেশের কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা।

'এভাবে মানুষ বাঁচে না। বাঁচতে পারে না। দেশের কথা ভাবো। আমাদের বয়েস হয়েছে। তোমরা নওজোয়ান। অনেক কাজ করতে হবে তোমাদের।'

বুকের মধ্যে কি যেন একটা গুড়গুড় করতো। যতীশ স্যারের হাত ধরে বলতে ইচ্ছে হতো—'কি করতে হবে? প্রাণ দিতে রাজী আছি।'

স্কুলে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় তপু দু-বার প্রথম হয়েছিল। প্রাইজ পেয়েছিল। কলেজে ঢোকার পর সেটা জানাজানি হলো। যতীশ স্যারের নাম করে দুজন আলাপ করলো ওর সঙ্গে। তারাও ছাত্র। কম্যুনিস্ট পার্টি করে। তপু ভিড়ে গেল।

এই দেশ, এখানকার মানুষ, জীবন-মৃত্যু, সবকিছুকে নতুন করে দেখতে শিখলো। আরো একটা শব্দের সঙ্গে পরিচয় হলো। বিপ্লব। এই একটা শব্দের পেছনে দিনরাত উধাও হয়ে গেলো। নেতারা বিপ্লবের কথা বলে। ব্যাখ্যা দেয়। শলা-পরামর্শ করে। তপু শোনে। শুনে যায়। ভেতরে-ভেতরে গুমরোয়। বিপ্লবের সাড়ায় রাজপথে, কলে-কারখানায়, খেতে-খামারে শয়ে-শয়ে মানুষ জীবন দেয়। কিন্তু ওই পর্যন্ত। শহীদবেদী, ফুলের মালা, ভিজে বক্তৃতায় সব শেষ। নেতারা সত্যিকার বিপ্লব করার নাম করে না। শুধু কথা বলে। বড়ো বেশি কথা বলে।

রাস্তার হদিশ চাইলে রেগে যায়। হুমকি দেয়। একটা জ্বালা ধরানো আগুন মুখে নিয়ে তপু বসে থাকে। গেলা যায় না। উগরোতে পারে না। ঝড়ের গতিতে ঘুরে বেড়ায়। মিছিল, সভা, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ক্লান্ত হয়। রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবে, কি করছি?

স্রেফ বক্তৃতাবাজীতেই যে শেষ হয়ে গেলো সব ? ধীরে-ধীরে বোঝে, এটাই এ-দেশের রাজনীতি। বক্তৃতা আর কথার ফুলঝুরিতে এখানে বাজিমাত হয়। এ-ব্যাপারে বাম, দক্ষিণে কোনো ফারাক নেই। মধ্যবিত্ত বক্তিয়ার খিলজিরাই এখানে সব দলের নেতা। ভালো বক্তার তাই এত কদর। এসব বুঝেছে অনেক পরে। তখন ও ছাত্রফ্রন্টের নেতা। পার্টি মহলেও কেউকেটা লোক। নামী বক্তা।

মাঝে-মাঝে যতীশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়। ভদ্রলোক আরো রোগা, শুকনো হয়ে গেছে। চোখে বাইফোকাল চশমা। বিড়বিড় করে—'এভাবে কিছু হবে না। এটা পথ নয়। আসল রাস্তা ধরো।' সেই রাস্তাটা কি, তপু ভাবে।

মার্কস, লেনিন, মাওসেতুং-এর লেখার সঙ্গে এর মধ্যে পরিচয় হয়েছে। রাস্তাটা আজকাল আবছা দেখতে পায়। নেতাদের সঙ্গে খটাখটি লাগে। রাস্তাটা আরো পরিষ্কার হয়। বিপ্লব মানে বিদ্রোহ, উগ্র বলপ্রয়োগের কাজ। এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করবে। জনগণই ইতিহাসের চালক, প্রকৃত বীর। জনযুদ্ধই একমাত্র পথ। নিজের ভাবনার কথা ও বন্ধুদের বলে। আলোচনা করে। পার্টির মধ্যে জানাজানি হয়। নেতারা দল থেকে একদিন দূর করে দেয় ওকে।

বিশ্বাস আরো শক্ত হয়। এটাই পথ, একমাত্র পথ। যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই। মারো কিংবা মরো, এটাই যুদ্ধের নিয়ম। এই নিয়ম সে মানে। সব বুঝেই সে লড়তে নেমেছে। তখন চারপাশে অনেক লোক। কারণ জনযুদ্ধ হচ্ছে জনগণের যুদ্ধ। একমাত্র তাদের উপর নির্ভর করেই এ-যুদ্ধ জেতা যায়। লক্ষ-কোটি মানুষ সঙ্গে থাকলে যে-কোনো কাপুরুষও বুক চিরে রক্ত দিতে পারে। তপু ভীতু, কাপুরুষ নয়। তবু এই মানুষ, মিছিল, ভিড়কে সে এড়াতে পারে না। ওদের চাই। ওদের দরকার। সেইভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু কেমন আশ্চর্যভাবে সব কিছু বদলে গেল। জনতা নেই। ভিড় পাতলা। যারা রাজনীতি বললো, প্রচার করলো, তারা পাত্তা পেলো

না। দু-চারজন হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা বীর আসর দখল করলো। তারা হুঙ্কার দিলো—'ঘটনা ঘটাও, ফয়দা ওঠাও। শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না ভিজলে দলে জায়গা নেই।'

একদিন মাঝরাতে লক আপের লোহার গরাদটা খুলে যায়। তপু জেগে ওঠে। নিকষ অন্ধকার। কিছুই দেখে না। বস্তার মতো ভারী কি একটা জিনিস বাইরে থেকে কয়েকজন ঘরে ছুঁড়ে দেয়। জোর শব্দ হয়। তপু সাড়া করে না। ঘুম কেটে যায়। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে ও দেখার চেষ্টা করে। কিছুই নজরে পড়ে না। ভোর রাতে চোখের পাতা ভারী হয়।

সকাল ছটায় চা-ওলা আসে। সঙ্গে এক টুকরো রুটি থাকে। আবার গরাদ খোলার শব্দ। তপুর ঘুম ভাঙ্গে। ও দেখে ঘরে আর একজন ছেলে। ও চেনে। জগদীশ। জগদীশও দেখেছে। চা-ওলা সিপাই-এর সঙ্গে চলে যায়:

'ধরা পড়ে গেলুম'—জগদীশ বলে। তপু দেখে জগদীশের প্যাণ্টে চাপ চাপ শুকনো রক্ত। শার্টটা ফালা-ফালা ছেঁড়া।

'কবে'—তপু জিজ্ঞেস করে।

'পরশু দিন পুরুলিয়ায়। কাল সকালে এখানে এসেছি।'

'কাল কোথায় ছিলে?'

আঙ্গুল দিয়ে জগদীশ লাল বাড়িটার ইঙ্গিত দেয়। 'শালারা মেরে চৌপাট করে দিয়েছে।' ও হাসে।

'এতো রক্ত কেন'—তপু জানতে চায়।

'পেছনে রুল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ছিঁড়েফুঁড়ে গেছে বোধহয়। তারপর কচুয়া ধোলাই।'

তপুর শরীর কেমন পাক খায়। ও কথা বলে না। জগদীশ ঠিক ওদের দলের ছেলে নয়। ওরা বিপ্লব চায়। বলে—'তার জন্যে দরকার টাকা, বন্দুক, মানুষ।'

ওরা কেউ এখন কথা বলে না। ঘণ্টা দুয়েক বাদে জগদীশের

দলের আরো দুজন আসে। দুজনেরই বিধ্বস্ত অবস্থা। তারা মড়ার মতো কিছু সময় শুয়ে থাকে। জগদীশ চায়ের ভাঁড় চিবিয়ে দাঁত মাজে।

দশটা নাগাদ তপুকে একজন সিপাই নিচে নিয়ে যায়। আজ ওর কোর্টের দিন। একতলায় একটা আয়না আছে। তপু নিজের মুখ দেখে। চমকে যায়। দাগী বদমাশের মতো লাল চোখ, রুক্ষ চুল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। নিজের জামাকাপড় থেকে একটা বদ-গন্ধ ওর নাকে লাগে।

একজন সিপাই হাতকড়া আর দড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে। তপুর বুকে কি একটা রাগ আছড়ে পড়ে। 'এসব কেন'—ও জিজ্ঞেস করে।

সেপাইটা এ-রকম প্রশ্ন আগে শোনে নি। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। একজন অফিসার এগিয়ে আসে।

'সম্মান যাবে নাকি'—সে খেঁকিয়ে ওঠে—'সুভাষ বোসকেও হাতকড়া লাগানো হয়েছিল। তুমি কোন হরিদাস পাল হে?'

তপু গুটিয়ে যায়। অফিসার বলে—'শালা ক্রিমিন্যাল।'

কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া নিয়ে তপু আর আয়নার দিকে তাকাতে সাহস পায় না। ক্রিমিন্যাল শব্দটা ছুঁচের মতো কানের পর্দায় বিঁধে থাকে। ভাবে, শেকল পরা সুভাষ বোসকে কেমন দেখাচ্ছিল সেদিন?

তপু জামিন পেয়েছিল। বাবা সঙ্গে করে ওকে পৌঁছে দিল ওর কাকার বাড়িতে। পায়ের এক্সরে করা হলো। মালাইচাকি ভেঙ্গেছে। প্লাস্টার করতে হবে। বসে থাকতে হবে একমাস। পনেরো দিন পরে কোর্টে হাজিরা। তপু ভেবে পায় না, সে কি করবে। পার্টি থেকেও কেউ দেখা করে নি। দিন চারেক বাদে কাকডাকা-ভোরে বাবা এলো। শুকনো মুখ, আলুথালু চেহারা।

'কাল রাতে আবার পুলিশ এসেছিল'—বাবা জানায়—'ওরা

বলছে, তোকে নাকি ভুল করে ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিয়েছে।’

তপু কথা বলে না। বাবা মাথার চুলে আঙুল ঢুকিয়ে কি যেন ভাবে।

সূর্য উঠেছে। রোদ এসেছে বারান্দায়। কলে জল পড়ার শব্দ। কাকের ডাক। সব কিছু জট পাকিয়ে তপুর মাথা ভোঁ-ভোঁ করে।

বাবা বলে—‘থানায় যেতে বলেছে। তা না হলে দেখলেই গুলি করবে, হুকুম আছে।’

তপু বোঝে, বাবা ওর মতামত জানতে চাইছে।

ওর মাথার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। দেখা করা মানে, আত্মসমর্পণ, হেরে যাওয়া, দাসখত। কোন পথ পায় না। দালাল হয়ে বাঁচবে, না গুলি খাবে? থানায় হাজিরা দিলে প্রাণের হয়তো আশা আছে। কিন্তু পাঁচজন হাসবে টিটকিরি দেবে। পার্টির লোকেরা ভাববে—দলছুট, ভীতু, এজেন্ট, প্রোভোকেটর। তপু অস্থির হয়। হাতের আঙুল মটকায়। ক্ষুদিরাম, ভগত সিং-এর কথা মনে পড়ে। পুলিশের গুলিতে মরা ভালো। মানুষ তবু জানবে, ও হারে নি। কিছু লোক ওর কথা ভাববে। মনে রাখবে। সত্যি কি ভাববে? মনে রাখবে? ওর মরার জন্যে দুঃখ পাবে কেউ? মাথার মধ্যে যুদ্ধটা চলে। ফয়সালা হয় না। বরেনদার কথা মনে পড়ে—‘লড়াই-এ নেমে বেশি ভাবনা-চিন্তা কোরো না। মারা পড়বে।’ তপু মন ঠিক করে। বলে—‘থানায় যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।’

বাবা গুম হয়ে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর নিঃশব্দে চলে যায়।

কুঁজো, অসহায় চলার ভঙ্গি। বাবাকে ওর চিরকাল এইরকম অসহায় মনে হয়। শুধু ঝি-চাকর, ধোপা-নাপিতের সঙ্গে কথা বলার সময়ে বাবার চেহারায় কিছুটা ব্যক্তিত্ব আসে।

হাঁটুতে প্লাস্টার আর করা হলো না। হাসপাতালে আজকাল শাদা পোশাকের পুলিশ থিক-থিক করে। নজর এড়ানো মুস্কিল।

অবশ্য ফোলাটা কমেছে, ব্যথা প্রায় নেই। শুধু হাঁটা-চলার সময় ভাঙা হাঁটুতে ছোট চিমটির কষ্ট। তপু জানে, থানায় না-যাওয়ার হ্যাঁপা অনেক। কোর্টে হাজিরের পথও এখন বন্ধ হবে। মুড়ি-মুড়কির মতো ওয়ারেণ্ট বেরোবে। ভালোই হলো। এখন থেকে পালিয়ে বেড়াতে হবে অনেক, অনেক দিন। ছাপোষা মধ্যবিত্ত জীবন সে চায় নি। সব মানুষের কিছু করার আছে। ভালো, সুস্থ তাজা। এই বোধটা একটা পোকার মতো ওর মাথায় ঘিনঘিন করতো। তপু সঠিক জানতো না, তার কি করার আছে। হদিশ পেতো না। ছেলেবেলায় বাজনার শখ ছিল। পাঁচ-সিকের মাউথ অরগ্যানে হিট গান তুলতে পারতো। ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় বাবার কাছে একটা পিয়ানো একোর্ডিয়ান চেয়েছিল। বাবা জিনিসটার নাম শোনে নি। হাঁ করে তাকিয়েছিল। সেই চাউনি আর মুখের ভাব দেখে তপু আশা ছেড়েছিল, বুঝেছিল, ওটা হবার নয়। সেই একোর্ডিয়ানটা পেলে ও হয়তো আজ বাজনার লাইনেই চলে যেতো। তা হয় নি। পাঁচ-সিকের মাউথ অরগ্যানের সঙ্গে বাজাবার শখ কবে হারিয়ে গেছে। এখন বাজনা শুনলে বুকটা কড়কড় করে। অভিনয়টা মন্দ করতো না। আশা ছিল, মাঝারি গোছের একজন অভিনেতা হবে। চেষ্টা করেছিল। হলো না। স্কুলে মাস্টারমশাইরা ওর লেখার প্রশংসা করতো। নদীর ওপর একবার চমৎকার একটা রচনা লিখেছিল। দেশভ্রমণের ওপর রচনা লিখে পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল। কোলকাতার বাইরে তখনও পর্যন্ত ও যায় নি। তবুও লিখেছিল নীল সমুদ্রঘেরা এক শহরের কথা। আকাশ যেখানে বিশাল। ঢেউ আর হাওয়ার মাতামাতি। দু-চার লাইন লেখার এলেম ছিল। মাস্টারমশাইরা বলেছিলেন—'লেগে থাকো। হবে।' দু-একটা লেখা নিয়ে সম্পাদকের দরজায় হাঁটাহাঁটি করেছে। পাত্তা পায় নি। তপুর ধারণা, বেশির ভাগ বড়ো পত্রিকার সম্পাদক কোষ্ঠ-কাঠিন্যে ভোগে। তাই দারুণ বদমেজাজী। তারপর বয়স বেড়েছে।

বুদ্ধিও একটু পেকেছে। কোন কিছু না হওয়ার দুঃখ তপুর নেই। একোর্ডিয়ান পাওয়ার, অভিনেতা বা লেখক হওয়ার জন্যে আরো কিছু দরকার। সেটা তপুর নেই। তপু জেনে অবাক হয়েছে যে, বেশির ভাগ ছেলের বুকে এই দুঃখ। কেউ দেখে না, বোঝে না। দাদা, কাকারা চাকরি আর প্রমোশন নিয়ে ব্যস্ত। আরো উন্নতি, আরো টাকা। তপুকে দেখে তারা হাসে। পাত্তা দেয় না। ভয় পায়। ছেলে-মেয়েদের সামলায়।

'বাপের খেয়ে সবাই রাজনীতি করতে পারে'—বড়দা হুল ফোটায়। বড়দা পদস্থ সরকারী অফিসার। সবসময়ে চাকরি যাবার ভয়। তপুকে ভাই বলে পরিচয় দেয় না। কোথা থেকে কি হয়, কে জানে। সকাল ন'টায় সরকারি গাড়ি আসে। বড়দা অফিস যায়। বাবা তখন রাস্তায় লুঙ্গি পরে রোদ পোহায়। বিড়ি টানে। বড়দার গাড়ি এলে সরে যায়। অফিসের লোকের সামনে বাবার সঙ্গে কথা বলে না। লজ্জা করে।

সেজদা একদিন হুম করে বাবাকে বললো—'বন্ধুরা সঙ্গে থাকলে রাস্তায় আমার সঙ্গে কথা বলো না।'

হাবার মতো বাবা তাকিয়েছিল। সেজদাও টাই কোট পরে অফিস যায়। মোটা মাইনে। বড়দা মেজদায় রেষারেষি আছে। আর একজন প্রতিযোগী বড়ো জামাইবাবু। সে আরও উঁচুতলার লোক। শ্বশুরবাড়ির লোকদের চাকর-বাকর ভাবে। দিদিকে বাপের বাড়ি আসতে দেয় না। নিজেও আসে না।

শুধু মা আছে তপুব দলে। 'সকলে একরকম হয় না'—মা বলে। 'আজকের যুগে সব মানুষের চোখ-কান খোলা রাখা উচিত। শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে কেন?'

মাঝরাতে পৃথিবীর সব প্রেতাত্মারা কলকাতাব রাস্তায় নেমে আসে। আলো অন্ধকারে তারা ঘুরে বেড়ায়। কঁকিয়ে ওঠে—'মা একটু ফ্যান দাও। তখন পৃথিবীর তলায় বাসুকি কাঁপে। পায়ের

নিচে মাটি টলমল করে। তপু দেখেছে, মা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দিকে দুটো চোখ। মা—তপু ডাকে।

ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি রে—মা বিড়বিড় করে।

তপু মায়ের হাতের ওপর হাত রাখে। মায়ের শরীরের নরম, মসৃণ চামড়া এখন খড়খড়ে। সব লোমকূপ কি-এক ব্যথায় যেন বিষিয়ে গেছে।

আবার সেই কান্নার শব্দ। ফেনের জন্যে ছ্যাঁচ। গোটা বাড়ি নিঝুম। দাদা, বৌদিরা ঘুমোচ্ছে। বাবা ঘুমোচ্ছে।

তপুর পিঠে হাত রেখে মা বলে—গোপালের বৌ আমাকে বলেছে তোর এক ছেলে ঋষি অরবিন্দ। সত্যিকারের মানুষ। যাবি একদিন তার কাছে?

তপু লজ্জা পায়। সাড়া করে না। গোপালদার বৌকে সে চেনে। বৌদি ডাকে। প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবার তার ভর হয়। তখন ভবিষ্যত বলে। আশ্চর্য অলৌকিক দৈববাণী করে। আসলে ফিটের রুগী, এপিলেপ্সি। তপু ওসব মানে না। তবু এই মধ্যরাতে এক আকাশ তারার নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বাড়ায় না। শোবে চলো—সে মাকে ডাকে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার আসার পর বড়দা একটু নরম হলো। মেজদা বললো—আমি বামপন্থীদের ভোট দিয়েছিলুম।

বাড়িতে তপুর খাতির বাড়লো। তপু মনে-মনে হাসতো। সরকারি কোন দলের সঙ্গেই তার যোগাযোগ নেই। বরং বড় শরিকদের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। তবু দাদারা ভাবতো, একদিন তপুও ওই দলে ছিল। অনেকের সঙ্গে চেনাজানা, ভাব-ভালোবাসা আছে। তপুও তাই কেউকেটা। ফ্রন্ট সরকার ওলটালো।

বড়দা বললো—বাঁচা গেল। ছোটলোকেরা কি শাসন চালাতে পারে? সেজদা সায় দিলো—ওরা হচ্ছে হাঘরে। চুরি করে ফাঁক করে দিয়েছে। পয়সাওলারা ক্ষমতায় থাকলে এই রেটে চুরি হয় না।

অজ্ঞাত—২

তাদের চুরি করার দরকারও নেই। তপু আবার অচ্ছুৎ হয়ে গেলো।

ছেলেবেলার ছবিগুলো এখন বারবার ভেসে ওঠে। তখন গ্রামে থাকতো। ইজের আর গেঞ্জি পরে স্কুলে যেতো। খালি পা। ক্লাসে থ্রিতে পড়ার সময়ে প্রথম একজোড়া জুতো পরেছিল। বিদ্যাসাগরী চটি। বাবা বড়বাজার থেকে পুজোর সময় ছিটের জামা কিনে আনতো। খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো পাড়াতো ভাই-এর ইজের আর জামা হতো। বাড়তি ছিট থাকলে কাজের চাকরটাও একজোড়া পেতো। পুরোনো শাড়ির পাড় দিয়ে মা ইজেরের টানা বানাতো। হাঁচলে ছিঁড়ে যেতো। সব কজন একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরোলে মনে হতো ইউনিফর্ম পরা ক্ষুদে সৈন্যবাহিনী। রাস্তার লোকেরা তাকিয়ে থাকতো। হাসতো, টিপ্পনি কাটতো। বিদ্রূপ গায়ে মাখার বয়েস তখন হয়নি। বড়ো চমৎকার ছিল সে-সব দিন।

গরমকালে সকালে স্কুল। ভোরের আলো ফুটিফুটি। পুব-আকাশে ডিমের কুসুম ভাসছে। পৃথিবীতে তখন অনেক পাখি ছিল। তাদের ডাকও ছিল বড়ো মিষ্টি। ফাঁকা মাঠে ফুরফুরে হাওয়া। সেই অগাধ ভোরে তপু একা-একা স্কুলে যেতো। চারপাশে ফাঁকা কি ঠাণ্ডা আর গভীর। এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়। সবকিছু বদলে গেছে। পৃথিবীটা এখন বড়ো শক্ত, আর নিষ্ঠুর।

অদ্ভুত এক জ্বালা বুকে চিড়বিড় করে। রাগ, হতাশায় একটা বেপরোয়া পাগলামি ভর করে মাথায়। ফলে যে লেখাপড়ার রাজত্বে তার খাতির ছিল, সেখানেও মার খেল। য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে ও তুলকালাম কাণ্ড জুড়লো। বাবা ক্লান্ত, নিরুপায়। মা অবাক। চোখ বুজলো ভয়ে। তপু বছর দুয়েক য়ুনিভার্সিটিতে গেলো, দাপাদাপি করলো। পরীক্ষা দেওয়া হলো না। গোটা জীবনটাই ভাসা—সিলেবাস বদলানোর দাবিতে নিরীহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

বস্তাপচা পাঠ্যসূচীতে শুধু ছেলেমেয়েদের মন ছিল না। কী অসার, নিরর্থক বাজে ব্যাপার। উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সেই ধারাই চলেছে। কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিদরাও যেন চাকরের জাত। ইংরেজদের তৈরি কাঠামোর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। একটু রদ-বদলের কথা শুনলে তাদের পিলে চমকে ওঠে। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অর্থনীতি, সাহিত্য সব বিভাগেই এক অবস্থা। আধুনিক পৃথিবী, সমাজ, জীবনের সঙ্গে এ-লেখাপড়ার কোন যোগ নেই। এই শিক্ষা শ্রম আর মানুষকে ঘেন্না করতে শেখায়। এটা বোঝাব জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন রাজনীতির দরকার হয় নি। অনেক ঠেকে ছেলে-মেয়েরা এটা শিখেছিলো। প্রফেসর লাহিড়ী তো তপুদের ক্লাসে খোলাখুলি বলতেন—এটা কি সিলেবাস, না গরুর জাবনা? এগুলো পড়ে হবে কি?

কি হবে, কেন পড়বো—এই প্রশ্ন দুটো ছেলেমেয়েদের মাথায় বহু বছর ধরে ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে তপুদের য়ুনিভার্সিটি জীবনে আগুনের আকার নিলো। অনেক কিছু না-বুঝেই তপু এই আন্দোলনে নেমেছিল। তখনও ওর মাথায় রাজনীতির কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। বাম, দক্ষিণের তফাত বোঝে, তার বেশি নয়। কিন্তু বামপন্থার মধ্যেও যে আসল এবং জাল আছে, এবং সংখ্যায় জাল লোকেরা যে বেশি, নানা ধাক্কায় সেটা ধরা পড়ে।

বিশেষ করে সেই সন্ধ্যের ঘটনায় ওর গোটা পরিচয় বদলে যায়।

আন্দোলনের চেহারা এবং প্রকৃতি নিয়ে ছাত্রনেতাদের মধ্যে মন-কষাকষি তখন তুঙ্গে। একটা অংশ বলছে রাজ্যে প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে। তারাও মান্ধাতা আমলের পাঠ্যসূচীকে আধুনিক বানাতে চায়। আপাতত আন্দোলন তুলে নিয়ে এই সরকারকে মদত দেওয়া হোক। নেতৃত্বের আর একটা অংশ এটা মানতে নারাজ। তারা মনে করে জনা-পঁচিশেক মন্ত্রীর হাজার সদিচ্ছা থাকলেও আন্দোলন ছাড়া কিছু বদলানো যায় না। তাই আন্দোলন

চলছে চলবে। দু-পক্ষের মধ্যে ফাটল বাড়ে। সরকারপক্ষের সমর্থকরা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকারী, দালাল বলে। বিরোধীরা সরকারী লোকদের শাসকশ্রেণীর চামচে বলে প্রচার চালায়।

চারপাশে এক অদ্ভুত বিভ্রমের হাওয়ার শুরুতে তপুর মাথা গুলিয়ে যায়। তারপর ও নিজেই পথ খুঁজে পায়। আন্দোলন ছাড়া এক পা এগোনো যাবে না।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর করিডোরগুলোয় তখন ধোঁয়াটে অন্ধকার। দোতলার বারান্দার ভেতরের কার্নিশে কয়েকশো পায়রা এর মধ্যেই ঝিমোতে শুরু করছে। বিশ্ববিদ্যালয় অফিসের কর্মচারীরা অনেক আগেই বাড়ি ফিরে গেছে। জুলাই-এর লম্বা বিকেল কিছুতেই শেষ হয় না। য়ুনিভার্সিটির চত্বর জুড়ে একটা থমথমে ভাব। দু-চার-জন সাধারণ লোক আর নাইট্গার্ড মাঝে-মাঝে নিচের লন থেকে গোটা ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করছে। দুপুর থেকে ভাইস চ্যান্সেলার ঘেরাও হয়ে আছে। ছাত্র সংগ্রাম কমিটির দাবি একটাই—সিলেবাসের ব্যাপারে এক্স্পার্ট কমিটি নিয়োগ করা হোক।

সরকার সমর্থক ছাত্রগোষ্ঠী আন্দোলনে আসে নি। বরং বিকেলের দিকে তাদের নেতারা হুমকি দিয়েছে, আন্দোলন তুলে না নিলে ওরা জবরদস্তি ভাইস্ চ্যান্সেলারকে ঘেরাও মুক্ত করবে। তখন থেকেই আবহাওয়া তেতে আছে। নানা গোপন খবর চালাচালি হচ্ছে। হাওয়ায় বিপদের গন্ধ। বিকেলের আগেই বাইরে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন হলো। সরকার জনদরদী। তাই পুলিশ ঢুকবে না। শান্তিকামী ছাত্ররাই এই অগণতান্ত্রিক আন্দোলনের মোকাবিলা করবে। খবর এলো শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তারা জমায়েত হচ্ছে।

ভাইস্ চ্যান্সেলারের ঘরের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের জটলা। ওরা আসছে, পার্থ বলে—ওরা সবদিক থেকেই তৈরি। বামপন্থীরা আন্দোলন ভাঙ্গার কাজে নামলো।

পার্থ এই আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক। আরেকজন সরকারী

পক্ষে চলে গেছে। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সকলকে সজাগ করে পার্থ ঘটনাটার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা শুরু করতেই বিপুল তাকে থামিয়ে দেয়।

বলে—ওসব আলোচনা পরে হবে। এখন আমরা কি করবো? ওদের ঠেকাবো, না এখান থেকে চলে যাবো? মূল প্রশ্নটা সভায় ছুঁড়ে দিয়ে বিপুল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

শঙ্কর বলে—আমরা এক-পাও পিছোবো না।

যদি পেটায়—বিপুল জানতে চায়।

আবদুল বলে—লড়বো।

এই একটা কথাতেই সভায় গনগনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আবদুলের দিকে ডান হাতটা উঁচিয়ে বিপুল বলে—হাত মেলাও কমরেড। শঙ্কর হাঁক দেয়—নো সারেণ্ডার।

পার্থ দেখে পরিস্থিতির রাজনৈতিক বিচারের হাওয়া নেই। সবটাই ওর হাতের বাইরে চলে গেছে। আবদুল আর বিপুল দ্বারভাঙ্গার পেছন দিয়ে হিন্দু হোস্টেলে চলে যায়। নীপা, কল্যাণী, মন্দিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে।

তপুর হঠাৎ মনে হয়—মেয়েদের এখন চলে যাওয়া উচিত। কথাটা ও পার্থকে বলে। সকলে শুনতে পায়। নীপা ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যামলা চেহারা গভীর চোখ, পিঠের ওপর একবেণী।

নীপা তাকায় তপুর দিকে। নীপার চোখে কি যেন সাংকেতিক আলো। ও তপুর ক্লাসেরই মেয়ে। ক্লাসে ডানদিকে তপুর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে ও বসে। তপুর প্রায়ই মনে হয় ওর দিকে নীপা তাকিয়ে আছে। পরীক্ষা করে ক্লাসে দু-একবার দেখেছে ওর ধারণাটা ঠিক।

নীপা বলে—তোমরা থাকলে আমিও থাকবো। নীপার গলায় কি এক উত্তেজনা ঝমঝম করে। তোমরা বলতে নীপা 'যে-তুমি' বোঝাতে চায় এটা শুধু তপু ধরতে পারে। কিন্তু এসব সংলাপ, দৃষ্টি, মনবিকলন নিয়ে তপু কোনদিন মাথা ঘামায় নি। এগুলোকে

ন্যাকামি ভেবেছে। এ-ব্যাপারে বন্ধুরা বেশি আদিখ্যেতা করলে ও ক্ষেপে যায়।

অনেক দূর থেকে শ্লোগানের শব্দ ভেসে আসে। কলেজ স্কোয়ারের সামনে সন্ধ্যের শুরু থেকে সুধীর চৌকি দিচ্ছিল। পার্থই পাঠিয়েছিল ওকে। সুধীর খবর দেয়, ওরা আসছে। প্রায় হাজার দুয়েকের মিছিল, হাতে লোহার রড, বাঁশ, কাঁধে সাইড্ ব্যাগে পেটো। মনে হয় আরো অনেক মাল আছে। ভাইস্ চ্যান্সেলারের ঘরের সামনে জনা পঞ্চাশেক ছেলেমেয়ের জমায়েতে একটা সন্ত্রাসের হাওয়া বয়ে যায়। মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ-কেউ।

শ্লোগানের ভাষা ক্রমশ স্পষ্ট হয়। চক্রান্তকারীদের কালো হাত ভেঙ্গে দেওয়ার আওয়াজ উঠছে। সকলেই জানে আজকাল ওরা আক্ষরিক অর্থেই হাত-পা ভেঙ্গে দিচ্ছে।

হঠাৎ দরজা খুলে ভাইস্ চ্যান্সেলার বেরিয়ে আসে। লোকটার চোখে মুখে কি এক নষ্টামির হাসি। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে—তোমরা বাড়ি যাও। উট্‌কো ঝামেলায় জড়িয়ে কি লাভ?

ছেলেমেয়েদের জটলার দিকে ঠাণ্ডা চোখে দু-সেকেণ্ড তাকিয়ে ভাইস্ চ্যান্সেলার নিজের ঘরে ঢুকে গেলে ঝকঝকে পালিশ করা আবলুস কাঠের কালো দরজা ধীরে-ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। তপুর মনে হয়, বন্ধ ঘরে লোকটা এখন তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ছে। জোরালো শব্দে ওর দু-কানের পাতা যন্ত্রণায় ঝনঝন করে।

কলেজ স্ট্রিটের ওপর নির্জন গেটটার চারপাশে আবছা অন্ধকার। লাইট পোস্টের আলোটা রাত বাড়লে রুগ্ন হয়ে যায়। আবদুল আর বিপুল হাঁফাতে-হাঁফাতে হাজির হয়। দুজনের হাতে দুটো ব্যাগ। পেছনে বিপুল। চটপট কয়েকজনকে বেছে তিনটে ছোট গ্রুপ করা হয়। তপু আর শঙ্কর ক্যান্টিনের পেছনে জায়গা নেয়। সঙ্গে আর একজন ছেলে। শঙ্কর বলে—এর নাম বিজন—বিজু। এই পাড়ারই ছেলে। তপু দেখে বিজুর ডান-হাতের তিনটে আঙুল নেই। তপুর

নজর দেখে বিজু হাসে। বলে—ছেষট্টির ফুড মুভ্‌মেণ্টে দুটো আঙুল শহীদ হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলুম। তারপর পুলিশের গুলিতে ফট্‌। জিভ দিয়ে ও একটা অদ্ভুত শব্দ করে।

গেটের বাইরে মিছিলের মাথা। প্রবল চিৎকারে কান পাতা যায় না। হঠাৎ নীপা ওদের পাশে এসে দাঁড়ায়। মাথার সামনের চুল এলোমেলো। কপালে ঘাম। শ্বাস পড়ছে দ্রুত।

শঙ্কর বিরক্ত হয়—এখানে এলে কেন?

নীপা কথা বলে না। ক্যাণ্টিনের রান্নাঘরের পাশে এক চিলতে দরজাটা দেখিয়ে শঙ্কর বলে—ওই দরজা দিয়ে সময় মতো কাটতে হবে।

বিজু হাসে। ফুট কাটে—লড়াইয়ের আগেই পালাবার রাস্তা বানিয়ে রাখা ঠিক নয়।

তপুর বুকের মধ্যে কি-এক উদ্বেগ টিপটিপ করে। ও বুঝতে পারে কি-এক অদৃশ্য শক্তির টানে ও সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। শঙ্করের কাঁধের ঝোলা থেকে বিজু একটা লোহার তৈরি তাল আঁটি বার করলো।

নিচু গলায় কিছু বলে—রেডি।

সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্কর একটা পেটো তুলে নেয়। গেটের মুখে মিছিলের দাপাদাপি, চিৎকার। ভেতরে ঢোকার আগে ওরা হয়তো শত্রুদের শক্তি যাচাই করার জন্যে একটু সময় নিচ্ছে।

আবদুল আর সুধীরকে নিয়ে পার্থ আছে নতুন বাড়ির তিনতলায়। মিছিলটা হঠাৎ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। পরপর দুটো প্রচণ্ড আওয়াজ। তপু বোঝে পার্থরা চার্জ করছে। কিন্তু মিছিলের স্রোত থামে না। বিজু বলে—এদের রিভলভার আছে। তপু দেখে ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে লোহার তাল আঁটি থেকে একটা পেরেক খোলার জন্যে বিজু চেষ্টা করছে। বেচারি! দুটো আঙুল বার বার ফস্কে যাচ্ছে। শঙ্কর বলে—বিজু, গ্রেনেড চালা।

ফিউজ নড়ছে না—বিজু জানায়।

মিছিলের মানুষগুলোকে তপু এখন পরিষ্কার দেখতে পায়। সামনের দুজনের হাতে দুটো কুচকুচে কালো রিভলভার। অনেকের হাতেই ডাণ্ডা, বাঁশ, আধলা ইঁট, পাথর। মাপা পায়ে মিছিলটা ঢুকছে। চারপাশে কড়া নজর।

দুটো বোমা চালিয়েই পার্থরা থেমে গেছে। ওরাও হয়তো মোক্ষম ঘা মারার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। তপু দেখে তার কাঁধের ওপর নীপার একটা হাত। এতক্ষণে তপু কিছুই বুঝতে পারে নি। নীপার এখানে আসা উচিত হয় নি—তপু ভাবে—ভাইস্ চ্যান্সেলারের ঘরের সামনেই সব মেয়ের বসে যাবার কথা। আজকের ঘেরাওয়ে এখনো পর্যন্ত আটজন মেয়ে আছে। বিজুর কপাল থেকে টুপটাপ ঘাম পড়ছে। শঙ্কর হিসহিস করে—সাবধান! হাতে ফাটলে আমরা চারজন গায়েব হয়ে যাবো।

তপু হঠাৎ বলে—আমাকে দাও। আমি খুলছি।

বিজু একবার তপুকে দেখে। জানায়—খুলেই ছুঁড়তে হবে। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে।

ঠিক আছে—তপু ঘাড় নাড়ে।

দ্বারভাঙ্গার দোতলা থেকে অনেকগুলো মেয়ের গলায় শ্লোগান ওঠে—ঘেরাও চলছে, চলবে।

আওয়াজটা কানে ঢুকতে বাইরের মিছিল ফুঁসে ওঠে। আকাশ ফাটানো চিৎকার করে ওরা ছুটে আসে। আর ঠিক তখনই শক্ত দাঁতে গ্রেনেডের ফিউজটা খুলে তপু ছুঁড়ে দেয়। পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে ঠিক মিছিলের পয়লা সারির ওপর ওটা ফাটে। এক ঝলক আগুন, প্রচণ্ড আওয়াজ। গোটা চত্বরটা দুলে ওঠে। তারপর দৌড়। পালাও। পালাও। চোখের পলকে মিছিলটা রাস্তায় উধাও হয়ে যায়। সামনে তাকিয়ে তপু দেখে একটা অচেনা শরীর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওর মাথা ঘুরে যায়।

তপুর কাঁধ চেপে বিজু বলে—সাবাস। আর নয়—শঙ্কর জানায়—

এখনি পুলিশ আসবে। রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে ওরা হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে চলে আসে। তারপর কলুটোলা স্ট্রিট। তপু এখন আর নীপার দিকে তাকাতে পারে না।

সেই ঘটনায় একজন মারা গেলো। তারপর তপু অনেকদিন য়ুনিভার্সিটি যায় নি। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মৃতদেহটার কথা ভাবলেই ওর শরীর শিউরে ওঠে। কে মারলো, এই প্রশ্নটা মাথায় ভর করলে ও ঘাড় তুলতে পারে না। মাঝে-মাঝে নিজের মনেই ও বলে—আমি মারি নি, আমি নয়। বিজু মেরেছে। তখনই সেই হাসির শব্দটা ভাইস্ চ্যান্সেলারের বন্ধ ঘর থেকে ছুটে আসে। ওর মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করে।

ঘটনার স্রোত, ইতিহাস এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী—হাওয়ায় তপু কথাগুলো ভাসিয়ে দেয়। আমি কিছুই জানি না। আমি কেউ নই। কিন্তু আবার সেই হাসি। ওর কানের পর্দা যেন ফেটে যায়।

লড়াইয়ের মাঠে তপু হঠাৎ সামনের সারিতে চলে এলো। তারপর আর থামে নি। কিন্তু এখন চারপাশ ফাঁকা। একা হয়ে গেছে। আঁকড়ে ধরার কিছু নেই। আর হঠাৎ বাঁচা আর মরার ঘূর্ণির মধ্যে দাঁড়িয়ে তার মাথা ঘোরে। বিপ্লব অথবা আত্মসমর্পণ, একটা বেছে নিতে হবে। সময় নেই।

পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হয়। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার গোলক ধাঁধা গলির মধ্যে বহুদিনের পুরোনো, একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা কয়লার দোকান। পার্থর সঙ্গে ও বাড়ির ভেতর ঢোকে। জল, কাদায় মাখামাখি একটা উঠোন। চারপাশে অনেকগুলো ঘর। সেই উঠোন পেরিয়ে ভেতরে আরো একটা উঠোন। আরো অনেকগুলো ঘর। ভাত, কাঁটা, আনাজের খোসা ছড়ানো। একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে পার্থর পেছনে ও দোতলায় ওঠে। সরু, লম্বা বারান্দা। বারান্দার শেষে একটা ঘর। দরজা বন্ধ। পার্থ দরজায় টোকা দেয়। দরজা খোলে। দুজনে ভেতরে ঢোকে।

ঘরটা বেশ অন্ধকার। তখন দুপুর। চারপাশ নিঝুম, চুপচাপ। তক্তাপোশের ওপর বরেনদা বসে আছে। তক্তাপোশে বরেনদার পাশে ঘরের মেঝেতে আরো জনাকয়েক ছেলে। মিটিং চলছিল।

বরেনদা ওদের দেখে। বলে—তপু যে, কেমন আছো? পায়ের কি দশা?

তপু হাসে। মেঝেতে জায়গা করে বসে যায়।

বরেনদা কেটে যাওয়া আলোচনার খেই ধরে—

এটা আত্মরক্ষার যুগ নয়, আত্মত্যাগের যুগ। শত্রুকে মওকা পেলেই আঘাত করো। শেষ করো। গ্রাম, শহর সব জায়গাতে লড়াই ছড়িয়ে দাও। যুদ্ধ হচ্ছে ঢেউ। একটা ঢেউ তোলো। তারপর ঢেউ উঠতেই থাকবে। স্ফুলিঙ্গ জ্বালাও। দাবানল তৈরি হবে।

তপু দেখে বরেনদা আরো রোগা হয়েছে। কপালে মুখে গভীর রেখা। মাথার চুল অনেক পেকে গেছে। বরেনদার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়। তপু কেঁপে ওঠে। কি চোখ! বরেনদার দু-চোখে ফসফরাস জ্বলছে। তপু চোখ নামায়। দেওয়ালের দিকে তাকায়। কোন এককালে শাদা রঙ ছিল। এখন ধুলো-ময়লায় কালো। নোনা ধরেছে। গোল, তিনকোণা জলের ছাপ। সেই ছাপ কখনো ভারতবর্ষের মানচিত্র হয়, কখনো ময়ূর, রবীন্দ্রনাথ অথবা উর্দি পরা পুলিশ।

বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের মাঝখানে কোন জায়গা নেই—বরেনদা বলে যায়—মানুষ বিপ্লব চায়। বিপ্লবের নামে মানুষকে প্রচুর ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। আর নয়। তোমরা সাহস দেখাও, ত্যাগ দেখাও। মানুষ তোমাদের বেছে নেবেই। বরেনদার খাড়া-খাড়া চুল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেছে। পুরু কাঁচের আড়ালে দুটো চোখ। বিশাল, গম্ভীর আগুন জ্বলছে সেখানে।

ঘরের মধ্যে সবাই চুপ। তপু এদের চেনে। কলকাতা আর আশপাশের নেতা গোছের ছেলে। কমল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—কিন্তু গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কি হবে? মুক্ত এলাকার কি দরকার নেই?

বরেনদা সিগারেট পাকাচ্ছিল। জিভের ডগা দিয়ে কাগজের আটা ভেজায়। জিভে থুথু নেই। প্রায় চারবার জিভ বোলাতে হয়। সিগারেট ধরিয়ে বরেনদা বলে—এটা আমাদের যুগ। মুক্ত অঞ্চল খুঁজছে শত্রুরা। আমরা নয়। গ্রামে, শহরে, যেখানে খুশি আমরা স্বাধীন এলাকা গড়তে পারি।

কমল কথা বলে না। তপু ভাবে, এটা কি হলো? এমন কথা তো ছিল না।

সিগারেট নিভে গিয়েছিল। বরেনদা সেটা আবার ধরায়। দুটো কাঠি লাগে। বরেনদার হাত কাঁপছে।

তোমার প্রশ্নটা আমি বুঝেছি, কমলকে লক্ষ্য করে বরেনদা জানায় যে আমার কথা বিশ্বাস করো। বাবা ছেলের থেকে লম্বা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাবা তাই ছেলের চেয়ে অনেক বেশিদূর পর্যন্ত দেখতে পায়। কিন্তু সেই ছেলে যখন বাবার কাঁধে ওঠে, বাবাকে ছাড়িয়ে যায়। আমরা অভিজ্ঞতা আর ইতিহাসের কাঁধে চেপেছি। সেটাই উচিত। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা শুধু লাইব্রেরি সাজাবার জিনিস নয়।

কমল বুঝে যায়। তপু শুনতে থাকে।

দালালদের থেকে সাবধান—বরেনদা হুঁশিয়ারি দেয়—বাড়ির মালিকের থেকে তার পোষা কুকুরটা কম দুশমন নয়।

ঘরের মধ্যে কি একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে। বরেনদা চোখ বুজে দেওয়ালে ঠেস দেয়। আধশোয়া ভঙ্গি। সবাই ওঠার তোড়-জোড় করে। তপুও দাঁড়ায়। বরেনদা সোজা হয়ে বসে। চোখ খোলে। তারপর বলে—একটা সুখবর দিই। আমাদের গণফৌজ তৈরি হয়েছে।

ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে। একটা চাপা আনন্দের শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। বরেনদা মুখে আঙুল লাগায়—আস্তে। আরো একটা সুখবর। আগামী পয়লা মে থেকে লিবারেশন রেডিও চালু হচ্ছে।

সকলের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয় ফুৎকারে উড়ে যায়। বুকভর্তি বারুদ

নিয়ে একজন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বরেনদা তপুকে বলে—তুমি একটু থাকো।

ঘরে এখন তপু আর পার্থ। পার্থ, বরেনদার কুরিয়ার সঙ্গী। ঘরের তাক থেকে কি একটা ওষুধ পার্থ এগিয়ে দেয়। জল আনে একগ্লাস। বরেনদা ওষুধ খায়। তপুকে বলে—তোমার পা-টা আগে সারাও।

তপু সায় দেয়।

কি করবে এখন? কোর্টে যাবে—বরেনদা জিজ্ঞেস করে।

না।

সাবাস। তোমাকে একটা দারুণ ইমপর্টান্ট দায়িত্ব দেবো।

তপু তাকায়। বরেনদা বলে যায়—গণফৌজের জন্যে দরকার সবচেয়ে সেরা ছেলে। যারা শেষ পর্যন্ত লড়বে। শহরে আসতে চাইবে না। ভেবে দেখলুম তার একটা উপায় আছে। জেল ভাঙ্গতে হবে। জেল থেকে যারা পালাবে, তাদের আর শহরে ফেরার উপায় নেই। তারাই হবে সেরা বাহিনী।

তপু কথা বলে না। তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ভিড় করে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, এতো কাজকর্মের মধ্যে মানুষ কোথায়? শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ? কিন্তু ইচ্ছেটাকে ও গিলে নেয়। বরেনদা ওকে জেল ভাঙ্গার ছক বোঝায়। গোটা পরিকল্পনাটার তুমি হলে কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ। জেলের ওয়ার্ডার, ডেপুটি জেলরদের হাত করো। মেয়ে কমরেডদের কাজে লাগাও। ভাব জমাক। দেখবে ওয়ার্ডার নিজের হাতে গেটের তালা খুলে দিচ্ছে।

তপু চুপ করে থাকে। দু-পাঁচশো ছেলেকে বার করে, তুমিও তাদের সঙ্গে চলে যাও—বরেনদা যোগ করে।

তাদের মধ্যে আলোচনা চলে। পার্টির গণফৌজ তৈরি, রেডিও চালু হবে। গণফৌজের ঘাঁটিতে সে নিজেও যাবে একদিন। সেখানকার মানুষ নিশ্চয়ই ভালোবাসে সেই ফৌজকে। সাহায্য করে। তা না হলে কি তারা টি‍ঁকতে পারতো। ওর হতাশা, ক্লান্তি, সন্দেহ কেটে

যায়। ভাবে, গুলি মারো, পিয়ানো একোর্ডিয়ান, সাহিত্য আর অভিনয়ের মুখে। আমি অনেক বড়ো জিনিস পেয়েছি। সময় আসছে। কারো দুঃখ থাকবে না। সব মুখে হাসি ফুটবে।

তুমি এখন ডঃ বিশ্বাসের বাড়িতে কিছুদিন থাকো—বরেনদা জানায়—ও পায়ে প্লাস্টার করে দেবে। প্লাস্টার কাটা হলেই কাজে নেমে যাও।

কমলের বাবা—তপু জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ। কমলকে আজ বলেছি। ও বাবার সঙ্গে কথা বলে রাখবে।

তপু রাস্তায় নামে। তখন অনেকটা অন্ধকার। কালো পেঁজা ধোঁয়ায় বুক বন্ধ হয়ে আসে। তপুর হঠাৎ মনে হয়, আসল প্রশ্নটার উত্তর পায় নি। সেই রাতে পালাতে যাওয়া কি ঠিক হয়েছিল?

এণ্টালী পদ্মপুকুরে ডঃ বিশ্বাসের বাড়ি। পরদিন সকালে তপু হাজির হয়। কমল বাড়ি ছিল না। কিন্তু বলে রেখেছিল। বাইরের ঘরে ডঃ বিশ্বাসের চেম্বার। ঘরে রুগী ছিল না। এক পলক তাকিয়ে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে—তুমি তপু?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কাল তোমার প্লাস্টার হবে। এই ভেতর দিয়ে সোজা দোতলায় চলে যাও। ডাক্তার আঙুল দিয়ে সিঁড়ির নির্দেশ দেয়। বেশ বড় বাড়ি। পসারওয়ালা ডাক্তার। এ-বাড়িতে তপু আগে আসে নি। সংকোচ হয়। দোতলায় কোথায় যাবে ভেবে পায় না।

জিজ্ঞেস করে—কমল আছে?

না। দোতলায় উঠে ডানদিকে ওর ঘর। দুটো খাট আছে। তুমি একটার দখল নাও।

তপু যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়।

ডাক্তার ডাকে—আর শোনো, আমাকে রাজনীতি বোঝাবার চেষ্টা

কোরো না। ওসব আমি বুঝবো না। সাতষট্টি বছর বয়সে বুঝেই বা কি লাভ?

কমলের বাবাকে তপুর বেশ লাগে। শাদামাঠা, ভালো লোক। কোন প্যাঁচ নেই। গোলগাল চেহারা। ঢলঢলে কোট, প্যাণ্ট। ফিটিং-এর বালাই নেই।

ডাক্তারের কথায় তপু হাসে। ডাক্তার যোগ করে—আমার বোঝার দরকারই বা কি? তোমরা, মানে আমাদের ছেলে-মেয়েরা দেশের ক্ষতি করবে না, এটা আমি বিশ্বাস করি।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকে—ডাক্তারবাবু।

তপু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠে। কমলের ঘর খুঁজে পায়।

তপুর পায়ে প্লাস্টার বাঁধা হয়। তিন-হপ্তা বাদে খোলা হবে। বাড়িতে আরো দু-রাত পুলিশ হানা দিয়েছে। কোর্টের জামিন বাতিল হয়েছে। গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরিয়েছে।

তপু ঠিক করেছে, সে আর ভাববে না। শেষ অবধি দেখবে। ভেবে লাভও নেই। এই রাস্তার একটা দরজা। ঢোকা যায় বেরোনো যায় না। বেরোনো মানেই মৃত্যু। ও এখন মনে-মনে ছক বানায়। জেল ভাঙ্গার ছক। তার কাঁধে নতুন যুগের সেনাদল তৈরির কাজ। কম কথা নয়। তারা লড়বে। হাওয়া ঘুরিয়ে দেবে। একদিন সে আর পাঁচজনের মতো উঁচু মাথায় রাস্তা হাঁটবে।

ছুঁচো, ইঁদুরের মতো অন্ধকারে পালিয়ে থাকার দিনগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হোক। তপু কাজ হাসিলের মতলব ভাঁজে।

কমলের মা, মা-লক্ষ্মীর দ্বিতীয় সংস্করণ। মা-লক্ষ্মীর মতো দুটো পা। দুটো চোখ। কাঁচা সোনার রঙ শরীরে। মুখে একটু বিষাদ আর ভাবনা।

আপনি এত চিন্তা করবেন না মাসিমা—তপু বলেছিলো একদিন।

মাসিমার মুখে হাসি ফুটেছিলো। মেঘ ছিলো সেই হাসিতে। তোদের জন্যে ভয় করে—মাসিমা জবাব দিয়েছিলো।

কিসের ভয়—তপু সাহস দেওয়ার চেষ্টা করে।

কি জানি—মাসিমা বিড়বিড় করে—সকালে কাগজ খুলতে সাহস হয় না। শুধু খুন আর খুন। রাস্তায় ঘাটে মরা মানুষের হরির লুঠ। রক্তে আমার বড়ো ভয়।

তপু বলে—রক্ত তো একটু পড়বেই। ফোঁড়া ফাটলে বদরক্ত বেরোয়। কিন্তু ফোঁড়া সারাতে সেটা দরকার। কি জানি—মাসিমা উঠে যায়।

প্লাস্টার বাঁধার পর পা-টা গদার মতো দেখায়, ভারি হয়ে ওঠে। হাঁটতে চলতে পারে না। শুয়ে বসে দিন কাটে। এক ঘুমে রাত কাবার হয় না। ঘুম ভাঙে। মাঝরাতে ঘরের মধ্যে হাল্কা আলো জ্বলছে। চোখ মেলে তপু অবাক হয়। চারপাশ নিঝুম। জানলার ওপাশে লক্ষ-কোটি তারায় ভরা আকাশ। তপু ঠিক কোথায় আছে ঘুম ভেঙ্গে প্রথমে খেয়াল হয় না। জায়গা পাল্টালে এটা ঘটে। জানলার দিক থেকে মুখ ঘোরায়। নিজের বিছানার ওপর কমল বসে আছে। তপু অবাক হয়। কমলের পাজামা গোড়ালির ওপর উঠে গেছে। খালি গা। চওড়া কাঁধ, কাঁচা হলুদ রঙের পিঠ ওর দিকে ফেরানো। মাঝরাতে কমল করছে কি, তপু ভেবে পায় না। মাথার ওপর পাখা ঘোরে। হাওয়ায় কমলের চুল ওড়ে। তপু উঠে বসে। কমলের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর শরীর শিরশির করে। ঝকঝকে রুপোলি আলপিন কমল নিজের নখের মাথায় ফোটাচ্ছে। পিনের ছুঁচলো মুখ আঙুলের মাংস ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে। বাঁ হাতের তিনটে আঙুলের মাথায় লাল পলার মতো জমাট রক্ত। কমলের বিকার নেই। তপুর জেগে ওঠা ও খেয়াল করে না।

কি করছিস—তপু নিচুগলায় জিজ্ঞেস করে।

বাঁ-হাতের অনামিকায় কমল তখন পিনটা ঠেকিয়েছে। থেমে যায়। তপুর দিকে ফিরে বলে—সহ্যশক্তির বহরটা দেখছি।

কি লাভ?

আছে—কমল ঘাড় নাড়ে। জীবনে একটা চড়চাপড় খাই নি। নিজেকে তাই একটু বাজিয়ে দেখা দরকার।

তপু কথা বলে না। কমল পিনটা টেবিলের ওপর রাখে। তারপর আঙুলের ডগার জমে থাকা রক্ত চুকচুক করে চুষে নেয়।

দারুণ টেস্টফুল—কমল বলে। ঘরের আলো নেভায়।

অন্ধকারে তপু বসে থাকে। উজ্জ্বল তারাভরা আকাশে একটা রঙমশাল জ্বলে। রঙমশালের ধোঁয়ায় ধূসর ছায়াপথ। তারার গুঁড়ো ঝিকমিক করে। তপুর মনে হয় এক বিরাট চেহারার মানুষ ওই ছায়াপথ ধরে হেঁটে চলেছে। অনেক, অনেক পথ তাকে যেতে হবে। তার পায়ের আঘাতে ছায়াপথে সোনার ধুলো ওড়ে।

কমল সেই ভোর রাতে বেরিয়েছে। রোজ বেরোয়। এখনো ফেরে নি। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি, পাতলা অন্ধকার। প্লাস্টারের মধ্যে বোধহয় একটা পিঁপড়ে ঢুকেছে। সেটা সুড়সুড়ি দেয়। কখনও কামড়ায়। তপু চা খেয়ে কাগজ ও-টায়। স্কুল কলেজ জ্বলছে। লাইব্রেরী পুড়েছে। দেশনেতাদের মুখে কালি। তাদের মূর্তি ধুলোয় লুটোচ্ছে। তপুর ভেতরে কে যেন বলে, ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না। স্কুল কলেজ পুড়িয়ে লাভ নেই। পুরোনো আমলের নেতা আর মনীষীদের মূর্তি ভেঙ্গে নস্যাৎ করা যাবে না। তাদের অনেক ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা আছে। সঠিক মূল্যায়ন করো। যুক্তি দাও। মানুষকে বোঝাও। লাইব্রেরি ভাঙার ঘটনাগুলোয় তোলপাড় হয় মনে। গরম লোহার চিমটে দিয়ে কে যেন চোখ উপড়ে নেয়। কিছু বলতে পারে না।

কমল ঘরে ঢোকে। খালি পা। কাদা জলে মাখামাখি। পাজামার বাঁ-পায়ের তলার দিকটা ছেঁড়া। ভিজে সপসপে পোশাক, মাথার চুল। জামা কাপড়ে টাটকা রক্তের দাগ। পকেট থেকে একটা ধারালো ঝকঝকে ছুরি বার করে। নেপালি কুকৃরি। অস্ত্রটার রুপোলি ঠোঁটে চাপ বাঁধা কালো রক্ত। শুকোয় নি তখনো।

কমল ছুরিটা টেবিলে রেখে ওর দিকে তাকায়। লাল চোখ।

শক্ত চোয়াল। বয়সে তপুর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। কমলের চোখে মুখে একসময় শিশুর ভাব ছিল। তপু দেখে, সেই চোখ-মুখের রং বদলে গেছে। এ-এক অন্য কমল। রক্তের নেশায় বুঁদ। রোজ ভোর রাতে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে আরো দু-তিনজন থাকে। পকেটে যন্ত্র সাঁটিয়ে শ্রেণীশত্রু খুঁজে বেড়ায়। এখনও সেরকম কিছু হাতের কাছে পায় নি। কিন্তু ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে। কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অস্থির হচ্ছে।

তপু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'শত্রু কারা?'

'জোতদার, সুদখোর মহাজন, মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ, ইনফর্মার।'

তপু আর ঘাঁটায় নি। বলেছিল, 'দেখো, নিরীহ মানুষ না মারা পড়ে।'

তপু ছুরিটা দেখে। ছুরির গলা পর্যন্ত রক্ত মাখামাখি।

কমল দু-হাতে মাথা ধরে বসে আছে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার, নীরবতা।

কমল হঠাৎ ডুকরে ওঠে, 'তপুদা, বড়ো ভুল হয়ে গেছে।'

'কি ব্যাপার?' তপু অবাক হয়।

'আজ ভোরে একটা সুদখোরকে কাটলুম। অনেকদিন তক্কে তক্কে ছিলুম। আজ মওকা পেয়ে ঝেড়ে দিলুম। কিন্তু লোকটার মাসে আয় মাত্র পাঁচশো টাকা।'

'সে সুদখোর নয়?'

'নামে মাত্র। পকেটে একটা ডায়েরি ছিল। সেটা দেখলুম। বাড়ি ভাড়া দিতে পারে নি ছমাস। উচ্ছেদের নোটিশটাও ছিল পকেটে।'

কমল কি একটা অস্বস্তিতে ছটফট করে। তপুর প্লাস্টারের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা বিষ পিঁপড়েটা কামড়ায়। জ্বালা করে।

'আগে খবর নাও নি'—তপু জানতে চায়।

'নিয়েছিলুম। কানু বলেছিল লোকটা টাকার কুমীর। মহা শয়তান।'

কমল থেমে যায়। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর খাড়া হয়ে বসে।

'কানুকে ছাড়বো না'—কমল বলে—'ও নিজে লোকটার কাছে তিনশো টাকা ধার করেছিল। সেটা মেরে দেওয়ার জন্যে কাজে লাগালো আমাদের।'

কমলের মুখের ভেঙ্গে-পড়া ভাবটা মুছে যায়। চোখে সাপের নিস্পৃহতা জাগে। বিড়বিড় করে—'এসব খবর এই মাত্র পেলুম। লোকটা খুব ভয় পেয়েছিল। পা জড়িয়ে ধরেছিল আমার। অথচ আমি ওর বুকে।' কমল চুপ করে যায়। তপুর শরীরের কাছে ঘেঁসে আসে। নিচু গলায় বলে—'মানুষের বুক ভারি নরম তপুদা। মাখনের মতো। হড়হড় করে ছুরি ঢুকে যায়। সব মানুষের বুক কি এতো নরম্?'

আকাশে মেঘ ঘন হয়। ওরা দুজন চুপচাপ বসে থাকে। কমল হঠাৎ বলে—'কানুকে ছাড়া নয়।'

এগারোটা নাগাদ মিলি ঘরে ঢোকে। কমলকে বলে—'মা ডাকছে।'

কমল চলে যায়। মিলির হাতে বই খাতা।

'কলেজ'—তপু জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'—মিলি হাসে—'আমি তো আর স্কুল-কলেজ ছেড়ে আপনাদের মতো বিপ্লবের কাজে ঝাঁপ দিতে পারলুম না।' মিলির কথায় খোঁচা। তপু রাগে না। এখানে আসারপর থেকে ও এই ভাষাই শুনছে। তপু হাসে। মিলির দিকে তাকায়। একেবারে মায়ের মতো দেখতে। ফর্সা রং, ঝলমলে চোখ। ভয়, বিষাদের কোন ছাপ নেই। হলুদ জমিতে সবুজের ডোরা-দেওয়া তাঁতের শাড়ি পরেছে। কপালে কুমকুমের টিপ। ভিজে চুল। আলগা বিনুনি।

'ক'টায় ক্লাস'—তপু প্রসঙ্গ বদলায়।

মিলি ছাড়ে না। বলে—'আচ্ছা, তপুদা, আপনারা তো স্কুল

কলেজ ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়েদের বিপ্লব করতে বলেছেন, কিন্তু আপনাদের নেতার ছেলে-মেয়েরা কেন স্কুল-কলেজে যায়?'

তপু এবারও কোন জবাব দেয় না। হাসে। মিলি চটতে থাকে। বলে, 'ভণ্ডামির একটা সীমা আছে।' তপু তাকায়। হাসে না। হাওয়ায় মিলির শরীরের হাল্কা গন্ধ। গন্ধটা তপুর চেনা। ছেলেবেলা পাড়ার একটা বাড়িতে ও খেলতে যেতো। সেই বাড়িতে তিনজন দিদি ছিল। বন্ধুর দিদি। স্কুল-কলেজে তারা পড়তো। মাঝে-মাঝে তপুকে বুকে জড়িয়ে আদর করতো তারা। তপুর বুকের রক্ত কি এত সুখে জমে যেতো। মিলি আবার খোঁচায়, 'আপনারা বলেন, যে যতো বই পড়ে সে ততো মুখ্যু হয়। আপনি এতো বই পড়েন কেন?'

'ভালো লাগে'—তপু জবাব দেয়।

'গাধা হয়ে যাবেন।'

তপু হাসে। 'আমার প্রশ্নগুলো আপনি এড়িয়ে যান কেন?' মিলির গলায় ঝাঁঝ। 'আমি কি প্রতিবিপ্লবী?'

তপু কিছু বলতে যায়। মিলি থামে না, বলে, 'নিশ্চয়ই তাই। আপনাদের কাছে মানুষের তো তুটো ভাগ। বিপ্লবী অথবা প্রতি-বিপ্লবী।'

তপু বাধা দেয়। বলে, 'না না, তা নয়। তুমি যদি সিরিয়াসলি পার্টির রাজনীতি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হও, আলোচনা করতে পারি।'

এতোক্ষণে মিলি হাসে, বলে, 'আমার মাথা ধরে যায়। আপনাদের ভাষা বুঝি না।'

ঘর থেকে বেরোবার আগে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমার ওপর খুব চটেছেন তো?'

কমল কিছু একটা আঁচ করে সেই রাতে বাড়ি ফিরলো না। টেলিফোনে মাকে জানালো, দিন-তুয়েক মাসির বাড়িতে থাকবে।

ঝামাপুকুরে ওর মাসি থাকে। তপু ব্লেড দিয়ে পেন্সিল কাটছিল। পার্টির দপ্তর থেকে নিয়মিত কিছু লেখা অনুবাদের জন্যে ওর কাছে পাঠানো হয়। একাধিক কপি লাগে।

কিছু আগে সন্ধ্যে হয়েছে। ময়লা আকাশ। তারা নেই। মিলি ঘরে ঢোকে। পাখাটা বন্ধ ছিল। চালিয়ে দেয়। টেবিলের ওপর তপুর কাগজ আর কার্বন পেপারগুলো ফরফর করে। তপু তাকায় না। পেন্সিল কাটায় ডুবে থাকে। মিলি বোঝে তপু মুখ লুকোতে চাইছে।

'দাদা শেষ পর্যন্ত খুন করলো'—মিলির গলায় কি এক কষ্ট বাজে।

তপুর বুক দুরদুর করে। ও দেখে মিলিকে। সকালের শাড়ি বদলেছে। হাওয়ায় এলো চুল বুকে কপালে চলে আসছে। কপালে সেই কুমকুমের টিপ। রাজরাজেশ্বরী মূর্তি। কিন্তু মুখের সেই ঝলমলে ভাব নেই। বিষাদ আর ভয়ের পাতলা সর।

'আপনি খুন করতে পারেন'—আচমকা এই প্রশ্নে ব্লেডটা পেন্সিল থেকে ছিটকে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে কামড় দেয়। ধারালো, নতুন ব্লেড। মাংসের চোকলা উঠে যায়। গাঢ় লাল রক্ত হাত বেয়ে টপটপ করে মেঝেতে পড়ে। তপু অসহায় চোখে তাকায়। মিলি ছুটে আসে।

'হাত কেটেছেন!' তপুর বাঁ-হাতটা সে টেনে নেয়। মিলির ফর্সা নরম হাতের পাতায় রক্ত মাখামাখি হয়। বাঁ-হাতটা ও তপুর ক্ষতের নিচে মেলে ধরে। ফোঁটা-ফোঁটা রক্তে ওর হাতের একরত্তি অঞ্জলি ভরে যায়।

'ইস, কি রক্ত!' ও বিড়বিড় করে। তারপব ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

আয়োডিন আর তুলো আনে। বাবার চেম্বার থেকে ব্যাণ্ডেজ এনে বেঁধে দেয়। হাত ধুয়ে আসে। বলে—'রক্ত দেখে মুখ কালো হয়ে যায়। বাবু আবার বিপ্লব করবেন।' মিলির গলায় খোঁচা নেই। মুখে স্নেহের হাসি।

তপু চটে। 'মোটেই না'—প্রতিবাদ করে।

মিলির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। নিচু গলায় বলে, 'রক্ত বড়ো দামী। মুখ কালো হওয়ায় কোনো লজ্জা নেই।'

ছু-দিন বাদে বাড়ি ফেরার পথে কমল এক সন্ধ্যেতে ধরা পড়লো। পরদিন সকালে কমলের বাবা থানার একজন কনস্টেবলের মুখে খবরটা শুনলো। লোকটা ডাক্তারের রুগী। চুপি-চুপি জানিয়ে গেল, 'আপনার বাড়িতে তল্লাসী হবে।'

ডাক্তারের চোখে উদ্বেগ। মুখ শুকনো। তপু শুনলো সব। বললো, 'আপনি প্লাস্টারটা কেটে দিন। আমাকে যেতে হবে।' তখনও তিন-চার দিন বাকি ছিল। ডাক্তার জানালো, 'তাতে কোন ক্ষতি নেই।' প্লাস্টার কাটা হলো। ডান-পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ফ্যাকাশে, শাদা। লোমগুলো সব মরে গেছে। যেন অন্যলোকের পা।

তপু নিজের ছুটো পাজামা, পাঞ্জাবি, ব্রাশ, কাগজপত্র খবরের কাগজে পুঁটুলি বাঁধলো। মিলি দাঁড়িয়েছিল। কমলের মার চোখে জল। একটা শান্তিনিকেতনী সাইডব্যাগ নিয়ে মিলি ফেরে।

'এটাতে ঢোকান,' সে বলে তপুকে। তপু ঝোলাটা নেয়। মিলির কলেজের ব্যাগ। সেই মিষ্টি গন্ধটা ব্যাগে জড়িয়ে আছে। এক মুহূর্ত ভাবে। তারপর খবরের কাগজ সরিয়ে জামাকাপড় ঝোলায় রাখে।

'মাসিমা আসি'—যাওয়ার জন্যে তপু পা বাড়ায়। লক্ষ্মী প্রতিমার মতো সেই মানুষটি আঁচলে চোখ ঢাকে। কি যেন বলে। তপু বোঝে না।

মিলি সদর পর্যন্ত আসে। বলে, 'পার্টি করলে মানুষ খানিকটা পাথর হয়ে যায়।'

'মানে।' তপু ঘুরে দাঁড়ায়।

মিলি কথাটা এড়িয়ে যায়—'কোন দরকার হলে ফোন করবেন। নম্বরটা মনে আছে তো?'

চারপাশে ভয়ানকভাবে ভাঙ্গচুর হয়ে যাচ্ছে। যা হওয়ার নয় তাই হচ্ছে। যা হওয়ার ছিল তার পাত্তা নেই। তপুর প্রায় মনে হয় সে একটা চিতাবাঘের পিঠে বসে আছে :

পার্থর সঙ্গে ফের যোগাযোগ হয়েছে। ও পার্টির নির্দেশ আনে। দু-এক মিনিট বসে। অল্প বয়সে মাথায় টাক পড়েছে। টাকে হাত বোলায়। ফর্সা মুখে এখন সবসময়ে ঘন উত্তেজনা। মুখটা লাল হয়ে থাকে। কম কথা বলে। উনিশশো আটচল্লিশে ওর বড়দা পুলিশের গুলিতে মরেছিল। তখন ও চার-বছরের শিশু।

পার্থকে দেখলেই কলেজের দিনগুলো তপুর মনে পড়ে। তখনও পার্থর মাথায় কিছু চুল ছিল। নিচু গলা, চিরকালই মুখচোরা। কম কথা বলে। পার্থ ছিল ওর বিরোধী পক্ষ। তারপরে কিভাবে যেন বন্ধু হযে গেলো। কলকাতার পুরোনো পাড়ায় ওরা থাকে। বাড়িটাও অনেকদিনের পুরোনো। বোধহয় ওদের বাড়ি থেকেই ও পাড়ার পত্তন। বাড়িতে অনেক লোক। কয়েকজন দাদা, একাধিক বৌদি, ভাইপো, ভাইঝি। সবসময় গমগম করছে। ওদের রান্নাঘরে এখনো জাফরান আর হিঙের সুবাস বেরোয়। কড়িকাঠে আগের বছরের তেলকালি। বাথরুমের ঢাউস চৌবাচ্চায় পাড়াগাঁয়ের পুকুরের গন্ধ।

পার্থর ছোট্ট ঘরটায় একটা খাট আছে। ও শোয়। খাটটা ওর ঠাকুর্দাব-ঠাকুর্দা বিয়েতে পেয়েছিল। ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দাকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর দিদিমা। এসব খবর পার্থর মার মুখে শোনা। পার্থ ছেলেবেলায় বাপ হারিয়েছে। সেই থেকে ওর মা ঠাকুরঘরে। রোগা ফর্সা ছোটোখাটো মানুষটির শরীরে ধুপ আর চন্দনের গন্ধ।

পার্থ থাকলে গল্প হয় না। সে অন্যকথা পাড়ে। বোঝা যায়, এসব তার পছন্দ নয়। সে মাকে কাটাতে চায়।

পার্থ রাজনীতিতে সামনে আসে নি। কিন্তু সবকিছু ও পরিষ্কার বোঝে। মাথা ঠাণ্ডা। লেখাপড়া করে। কতো রাত দুজনে পাশাপাশি

শুয়েছে। পার্থর বুকের ওপর হাত রেখে তপু সারারাত অঘোরে ঘুমিয়েছে। পার্থ নড়ে নি। হাত সরায় নি। হয়তো তপুর ঘুম ভেঙে যাবে। পার্টিতে সবচেয়ে শক্ত কাজগুলো ও কি সাবলীলভাবে করে। মুখে কোন চাপ বা চিন্তার ছাপ পড়ে না। সাইডব্যাগে একডজন পাইপ গান নিয়ে ঢুলকি চালে রাস্তায় হাটে। সিগারেট খায়। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারে। এতো নরম এবং জেদী ছেলে তপু দেখে নি। মাঝে-মাঝে মনে হয় পার্থ আর ও যেন যমজ ভাই।

পার্থ একদিন মণ্টুকে নিয়ে আসে। মণ্টু পার্টির পুরোনো ছেলে। রোগা কালো মাঝারি চেহারা। একমুখ দাড়ি। মণ্টুর পেটে পাঁচটা গুলির দাগ। পুলিশ ওকে পাঁচটা গুলি করেছিল। তারপর মরে গেছে ভেবে গাড়ির পেছনের ক্যারিয়ারে পুরে হাসপাতালে আনে। পোড়ানোর আগে ডেথ সার্টিফিকেট দরকার। এমার্জেন্সির ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লেখার আগে স্টেথো নিয়ে বুকটা দেখতে যায়।

মণ্টু কোন মতে ফিসফিস করে, 'ডাক্তারবাবু আমি বেঁচে আছি।'

ডাক্তার চমকে ওঠে। ঘটনাটা বলতে গিয়ে মণ্টু হেসে অস্থির। ওর সাদা দাঁতের মাড়ি ঝকঝক করে।

দিন-সাতেক আগে কোর্ট থেকে ফেরার পথে ও পালিয়েছে।

মণ্টু নিজের ধরা পড়ার গল্প বলে। মিলিটারিতে পাড়া ঘিরেছিল, কোম্বিং অপারেশন।

'বোকামির জন্যে ধরা পড়লুম'—মণ্টু আপসোস করে—'পকেটে ছিল। একটা বারোয়ারি ফ্ল্যাটবাড়ির ছাতে ছিলুম। ওখানে একটা চিলেকোঠায় তখন আমাদের ডেরা। দারোয়ান ভালো মানুষ। আমাদের থাকতে দিয়েছিল। ঘরে তখন আমি একা। এ্যাট ইজ

ছাত থেকে জাম্প দেওয়া যেতো। পাশের ছাত হাত দশ-বারো দূর। বুকটা কাঁপলো। কেন এমন হলো কে জানে। পুলিশ তখন এসে গেছে। ঘোড়া বার করার সময় পেলুম না।' মন্টু হাসে। 'গুলির দাগগুলো দেখা'—পার্থ বলে।

মন্টু হাওয়াই শার্ট বুকের ওপর তোলে। ডানদিকে ঠিক ফুসফুসের তলা থেকে তলপেট পর্যন্ত পাঁচটা শুকনো, ঝাঁঝরা গর্ত। দেখে গা শিরশির করে। মন্টু জামা ছেড়ে দেয়। গোঁফ পাকায়। ঝাঁকড়া চুল। চওড়া বুক। মুখে গঙ্গাজলে ধোয়া হাসি। বড়ো সরল আর নিরীহ।

ওর কাহিনী পার্থ সব জানে। তবু খোঁচায়—'ধরেই গুলি করলো?'

'দুর'—মন্টু ওকে থামায়—'গোড়াতে আমাকে চেনে নি। থানায় নিয়ে গেল। ও. সি-র মুখোমুখি অনেকক্ষণ বসেছিলুম। একটা নাগাদ রাজকুমার এলো। ডিডিব লোক। গভর্নমেণ্টের গুণ্ডা। ও আমাকে চিনলো। দেখে চমকে গেলো। তারপর শুরু হলো ধোলাই। চার-পাঁচজনে পেটালো। বেহুঁশ হয়ে গেলুম। বিকেলের দিকে জ্ঞান ফিরলো। আবার মার। খুব খিদে পেয়েছিল। তেষ্টায় গলা কাঠ। এবারে আরো তাড়াতাড়ি জ্ঞান হারালুম।

'তৃতীয়বার যখন হুঁশ এলো তখন রাত বারোটা। থানার মধ্যে একটা বড়ো ঘড়ি আছে। বারোটা বাজার শব্দ পেয়েছিলুম। আমার দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। আমি চোখ বুজে পড়ে রইলুম। অজ্ঞান থাকলে ধোলাইটা হবে না। ওরা কিন্তু ধরতে পারে। কোমরে লাথি মেরে রাজকুমার দাঁড় করায় আমাকে। বাইরে আনে। একটা কালো এ্যাম্বাসাডারের ক্যারিয়ারে ঢোকায়। গাড়িতে আরো তিনজন ছিল। আমি পুঁটলি পাকিয়ে শুয়ে থাকি। রাস্তায় লোকজন নেই। চারপাশ কি চুপচাপ। রাজকুমার ক্যারিয়ার বন্ধ করে। গাড়ি ছুটছে। ক্যারিয়ারের মধ্যে পুরোনো একটা টায়ার, মোবিল, ডিজেলের কয়েকটা খালি টিন।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। নড়তে পারি না।

'ওরা কথা বলে। সিনেমা নিয়ে আলোচনা করে। বাগদা চিংড়ি একস্‌পোর্ট হওয়ায় খুব মুস্‌কিল হচ্ছে। আমি শুনতে পাই।

'গাড়ি থামে। দু-চার সেকেণ্ড পরে একজন ক্যারিয়ার খোলে। আমাকে টেনে নামায়। বলে—বাড়ি যা। লোকটার মুখটা চৌকো। কটা চোখ। রাজকুমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আরো একজন অফিসার নামে। লম্বাচওড়া শরীর। বিরাট মাথা। কুঁচো চুল। কুঁতকুঁতে চোখ। কি ঠাণ্ডা চাউনি।

'জায়গাটা আমি চিনতে পারি। বেলেঘাটা লেক। অনেক গাছ। ঘন অন্ধকার। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। একবার পিকনিকে এসে ঠিক ওই জায়গাটায় আমরা ক্রিকেট খেলেছিলুম। তখন আমি স্কুলে পড়ি। আমি বুঝি ওরা আমাকে পেছন থেকে গুলি করবে। কিন্তু মাথায় একটা মতলব খেলে। দুপা গিয়েই আমি ঘুরে দাঁড়াই। যা ভেবেছি তাই। পর-পর তিন রাউণ্ড ফায়ার হয়। দুটো তলপেটে লাগে। একটা পাশ দিয়ে যায়। আমি পড়ে যাই।'

'গুলি লেগেছে বুঝেছিলি'—পার্থ জিজ্ঞেস করে।

'সেটা বুঝেছিলুম। হাইভোল্টের ইলেক্‌ট্রিক শক এরকম জোর ধাক্কা দেয়। কিছু সময় অসাড় লাগে। কে একজন এগিয়ে আসে। আমি চিনতে পারি না। আলো-হাওয়া-অন্ধকার তখন একাকার। মনে হচ্ছে চারপাশ দিয়ে ঝিরঝির করে চুনের জলের স্রোত বইছে।

'সে লোকটা আমার নাকে হাত ছোঁয়ায়। বলে—শালা মরে নি। চল, আউট্রাম ঘাটে যাই—গাড়ির একজন পরামর্শ দেয়।

'ওই ঘোর-ঘোর অবস্থার মধ্যে ভাবি, দমবন্ধ করে থাকা উচিত ছিল। তাহলে হয়তো ওরা ফেলে যেতো আমাকে।'

'একটু মাল দরকার।'

'বোতলটা কোথায়।'

'বোতল খালি।'

'আউট্রামে পাওয়া যাবে।'

'কথা শেষ করে ওরা আমাকে আবার গাড়িতে তোলে।

'আমার একটা ঠ্যাং ধরে মরা কুকুরের মতো একজন আমাকে গাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। আমার কিন্তু কোন কষ্ট হয় না। গাড়ি চলতে শুরু করে।

'আমার মুখের ওপর দিয়ে চুনের জলের মতো স্রোত বয়ে যায়। আধো জাগা, আধো ঘুম অবস্থা। ওদের কথাবার্তার টুকরো-টাকরা কানে আসে। অনিলের ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো, নতুন গ্রেডে তার প্রোমোশন হবে। রাষ্ট্রপতির পদক ও পাবেই। রাজেশখান্না··· বারবধূ। গলাটা ভেজানো দরকার। গাড়িটা যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অন্ধকার-অন্ধকার। আবার চোখ ঝলসানো আলো আর আলো।

'গাড়িটা দাঁড়ায়। আমি সজাগ হই। যে-করেই হোক বাঁচতে হবে। একজন এসে ক্যাবিয়ার খোলে। পেট্রোল, ডিজেলের গন্ধ ছুটে যায়। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া কপালে লাগে। আমি তাকাই। রাস্তার আলোগুলো কেমন গলাগলা দেখায়। যেন বরফের টুকরো।'

'কইমাছের জান'—কে একজন বলে।

'ওরা আমাকে দাঁড় করাতে চায়। আমিও চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। আবার ছুটো গুলি লাগে। সেই তলপেটে। অন্ধকার, আলো, কুয়াশা, আলো। আমি তখনও মরি নি। বাঁচতে হবে। দাঁত টিপে আমি অভিনয় করি। মরার অভিনয়। বাঁচার জন্যে মরার ভান। শরীরের ভেতর যেন সূর্যটা আটকে গেছে। ছুটোছুটি করছে।

'একজন আবার হাত লাগায় আমার নাকে। একিরে শালা মরে নি। সে বলে। কে একজন জানায়—মাল নেই।'

'নিমতলায় চল। ওখানে মিলবে।'

'এটাকেও তোল। আর একটা গুলি খরচ হবে। তারপর ওখানেই পুড়িয়ে দেবো।'

'আমাকে আবার ক্যারিয়ারে তোলে।' মণ্টু হাসে। 'পাঁচ নম্বর গুলিতেও মরি নি। আমার এখন প্রচুর কাজ। অনেক দিন বাঁচতে হবে।' 'তোকে আমরা মিলিটারি কাউন্সিলের ভাইস্ চেয়ারম্যান্ করবো'—পার্থ বলে।

'লিন্ পিয়াও'—মণ্টু তাকায়। 'আর একবার বল ওস্তাদ।'

'পালানোর গল্পটা বল।' পার্থ আবদার করে।

'সেও মজার। অনেকদিন তক্কে-তক্কে ছিলুম। মওকা খুঁজছিলুম। জেলের ওয়ার্ডার, বাইরের সিপাইদের সঙ্গেও খাতিব হয়েছিল। আমার পেটের ঘা দেখে ওরা চমকে যেতো। পুলিশকেই গাল পাড়তো। লোকগুলো খারাপ নয়।' 'মানে'—তপু থামায় ওকে।

'সব পুলিশ খারাপ নয়'—মণ্টু বলে—'ভালো লোকও আছে। গুণতিতে তারা কম নয়। তা না-হলে আমি পালাতে পারি?'

'বললুম—ভীষণ পায়খানা পেয়েছে। একজন সিপাই হাতকড়ি খুলে দিল। আর একজন দাঁড়িয়েছিল পাশে। খুব দোস্তি হয়েছিল ওদের সঙ্গে। আমাকে খাতির করতো। কিন্তু কি করবো। হাত খোলা পেয়ে দুহাতে ঠেলে দুই থাবড়া মারলুম। তারপর আমায় পায় কে।' কাহিনী শেষ করে মণ্টু কি যেন ভাবে। যোগ করে, 'কিন্তু সঙ্গের কমরেডদের বড়ো খারাপ হবে।'

যাবার সময় পার্থ আড়ালে তপুকে ডাকে। একটা ছোট রিভলভার দেয়। বলে—'বরেনদা পাঠিয়েছে। রাখ।' পার্থ যোগ করে—'জেল ওড়ানোর কাজে মণ্টু ছাড়া আরো দুজন আছে। নিয়ে আসবো।' গলা আরো খাদে নামে। ফিসফিস করে। 'পার্টির বিশ হাজার টাকা গায়েব। এদিকে বরেনদার শরীর খুব খারাপ। কাল সকালেই একটা ইঞ্জেকশান দরকার। খুব জরুরী। একশো টাকার মতো দাম। আমার পকেট খালি। টাকাটা জোগাড় করে দে।'

এসব খবর শুনে তপুর আজকাল কোন সাড়া জাগে না।

জিজ্ঞেস করে, 'কার কাছে যাওয়া যায়?'

পার্থও ভেবে পায় না। দু-জনে চুপ। পার্থ হঠাৎ বলে—'প্রণবের কাছে যা।'

'ওর কাছে নেই।'

'চেষ্টা কর।'

'তুই ওদের একটা ফোন করিস'—তপু বলে—'সন্ধ্যেবেলায় যাবো ওর বাড়ি। রাতটা ওখানেই থাকবো।'

ওপাশ থেকে মণ্টু হঠাৎ বলে ওঠে—'চাবির গোছাটা হাতানো হলো বড়ো কাজ। তারপর জেল গেট চিচিং ফাঁক।' তপু, পার্থ ওর দিকে তাকায়।

মণ্টু ঝকঝকে দাঁতে হাসে।

পার্থ বলে—'শুনেছি, প্রণব ডাকাত পার্টিতে ভিড়েছে।'

'বাজে কথা'—তপু উত্তর দেয়। ওরা দুজন চলে যায়। তপু চুপচাপ বসে থাকে। বাইরে বিশুদ্ধ রোদ। এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া। ছেলেবেলায় রচনায় লেখা সেই সুন্দর সমুদ্র শহরটার কথা ওর মনে পড়ে।

প্রণব আগে থাকতো সিঁথিতে। কসবায় এসেছে ছমাস। বিয়ে করার পর। পার্টির টগবগে কর্মী ছিল। এখন একটু ছাড়া-ছাড়া। কি যেন হয়েছে। তপু ভেবেছিল বিয়ে করার ফল। কিন্তু পার্থর মুখে ডাকাত পার্টির নাম শুনে ও একটু চমকেছে। প্রণব য়ুনিভার্সিটির সহপাঠী। ওর বউ রমা একসঙ্গে পড়তো। তপু ধাঁধায় পড়ে। প্রণব নিজে একদিন বলেছিল, ওসব টাকা, বন্দুক, তত্ত্ব আমি মানি না।

প্রণবের বাড়ি কাঁথি, মেদিনীপুর। গায়ের রঙ দারুণ ফর্সা।

মাথার চুল কটা। ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু। তারপর পার্টির সারাক্ষণের কর্মী। সবসময় কিছু কাজ মাথায় রাখে। মড়া পোড়ায়, টিকে দেয়, নর্দমায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ায়। এলাকায় বেশ বড়ো বড়ো একটা কাহিনী আছে।

য়ুনিভার্সিটির একটা ঘটনা তপুর মনে আছে। ট্রাম আন্দোলন। কলকাতা কাঁপছে। য়ুনিভার্সিটি গরম। আগের দিন পুলিশ য়ুনি-ভার্সিটির সামনে ছেলেদের ঠেঙ্গিয়েছে।

রাস্তা ফাঁকা। ট্রাম বাস নেই। কলেজ স্কোয়ারের বেশিরভাগ স্টল বন্ধ। দু-একজন হকার আধখানা ঝাঁপ তুলে উঁকি দিচ্ছে। আশেপাশের সবকটা রাস্তায় পুলিশ পিকেট। ঘনঘন কালো গাড়ির যাতায়াত। পথসভা করার জন্যে ওরা রাস্তায় নামে। একটা টুল মাঝে রেখে ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়ায়। তপু বলতে শুরু করে। বুকে, মাথায় অসহ্য তাপ। সবকিছু যেন পুড়ে যায়। এই সরকার, সমাজ, রাষ্ট্র কি দরকার? হঠাৎ কে যেন ওর হাত ধরে হেঁচকা টান দেয়। ও টুল থেকে পড়ে যায়। গুলির শব্দ।

মাথার দু-ফুট ওপর দিয়ে এক ঝলক আগুন ছুটে যায়। চার-পাশে কেউ নেই। প্রণব ওর হাত ধরে ডাকছে—'চল, ভেতরে চল।' তপু কি-এক ঘোরে প্রণবের সঙ্গে একছুটে য়ুনিভার্সিটিতে ঢোকে।

'একসেকেণ্ড দেরি হলে মরতো' কে যেন বলে।

প্রণব ভিড় হটায়। তপুর হাতে জলের গ্লাস দেয়। —'জলে চুমুক লাগা।' পরে তপু ঘটনাটা শোনে। রাস্তার দুপাশ থেকে দুদল উর্দিপরা পুলিশ ছুটে আসছিল। সামনে অফিসার। হাতে খোলা রিভলভার। যে-যার মতো পালায়। প্রণব বোঝে তপু দেখে নি। খানিকটা এগিয়ে ও আবার ফিরে আসে। তপুর হাত ধরে।

রাজনীতির উঁচুনিচু অনেকগুলো ধাপ ওরা একসঙ্গে পেরিয়েছে।

প্রণবকে কেউ সমালোচনা করলে তপু রাগে। ও জানে, প্রণবও তাই। তার বদনাম প্রণব সইবে না।

প্রণবের বিয়েটাও বড়ো অদ্ভুত। রমা য়ুনিভার্সিটি ইউনিয়নের মেয়ে। কাজও করতো সংগঠনের। আর পাঁচজন ছেলেমেয়ের মতো রমার সঙ্গে প্রণবের চেনাশোনার সম্পর্ক। হঠাৎ একদিন সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে রমা য়ুনিভার্সিটিতে এলো। সবাই অবাক। বর কে? বর কে? জানা গেল প্রণব। আবার খানিকটা হৈ চৈ। কেউ বোঝে নি। ভাবতেও পারে নি। প্রণবকে জিজ্ঞেস করলে ও হাসতো।

তপুকে আলাদা একদিন বলেছিল—'বিয়েটা হওয়া খুব দরকার, রমার বাবা আমাকে বলেছিলেন। রমার পরের বোনের পাত্র ঠিক। কিন্তু রমার জন্যে আটকে আছে। রমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলুম। রাজী হলো।'

তপু আর খোচায়নি। তবে বেশ মজা লেগেছিল। ওর সমবয়সী কোন বন্ধুর আগে বিয়ে হয় নি।

প্রণবের কসবার বাড়িতে তপু আগে একবার এসেছে। বাড়িটা নতুন, তিনতলা। দোতলার ফ্ল্যাটটা ওরা ভাড়া নিয়েছে। রমা ভালো চাকরি করে। আটটা নাগাদ তপু ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়ে। দোতলার সিঁড়ির আলোটা খারাপ। একতলা আর তিনতলায় আলো জ্বলছে। এখানে সামান্য হলুদ ছায়া। তপু দু-তিনবার কড়া নাড়ে। দরজায় টোকা দেয়। ফ্ল্যাটের ভেতরটা অদ্ভুত শান্ত। কোন শব্দ আসে না। পার্থ কি খবর দেয়নি, তপু ভাবে। হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। তপু অবাক হয়। রমা দাঁড়িয়ে। বলে—'অফিস থেকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি রোজ। যা খাটুনি।' রমার মুখে ক্লান্তি এবং ভয়। তপুর মনে হয়, সত্যি বলছে না। ও ঘুমোয় নি। জেগে ছিল। 'প্রণব কোথায়'—তপু জিজ্ঞেস করে।

'বেরিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে।'

রমা চা বানায়। ওরা দুজন মুখোমুখি বসে চা খায়। কথা বলে। রমা মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। কথায় প্রাণ নেই। দায়সারা ভাব।

তপু এক সময় বলে, 'একশোটা টাকা দরকার।'

'এখনি,' রমা জানতে চায়।

'না, কাল সকালে। যাওয়ার আগে নেবো।'

'টাকা আছে,' রমা বলে।

রাত বাড়ে। বাইরের গুঞ্জন ফিকে হয়। দু-ঘণ্টা কাটে। প্রণব ফেরে না। তপুর মনে হয়, রমা জানতো, প্রণব ফিরবে না। তবু চেপে গেছে। একটা আবছা দুঃখে তপুর মন ভরে যায়। এক সময় প্রণব তার খুব কাছের লোক ছিল। কতো সুখ-দুঃখ একসঙ্গে ভাগ করেছে ওরা। তার সঙ্গে আজকের এই লুকোচুরির কোন মিল নেই। কে যেন দুধে ফিটকিরি ফেলেছে। স্মৃতি, বন্ধুত্বে ছানা কেটে গেছে। ফ্যাকাশে লোমওঠা পায়ে ও হাত বুলোয়। ভাঙা মালাই চাকিটা জুড়েছে কিনা কে জানে?

রাতে খেতে পারলো না ভালো করে। মুখে স্বাদ নেই। রমার সঙ্গে টুকিটাকি কথা হলো। রমার পাশের ঘরে মেঝেতে তোষক পেতে শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরটা খালি। একটা চেয়ার টেবিল আছে। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার, লেনিনের ছবি। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ও চেয়ারে বসলো। রমা একগ্লাস জল রেখে গেল বিছানার পাশে। বললো, 'আজ বোধহয় প্রণব ফিরলো না। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

রমা দরজা ভেজিয়ে চলে গেল। মুখের সামনে কাগজ ধরে তপু সাত-পাঁচ ভাবে।

আজকাল সারাদিন গুজ-গুজ ফুস-ফুস ষড়যন্ত্রে কাটে। প্রাণ খুলে কেউ কথা বলে না। বুকচাপা, ভারি হাওয়া। থমথম করে। গুজব রটে। রোজ মারা যাচ্ছে দু-চারজন। জেলে ঢুকছে। তপুর বাড়ির কথা মনে পড়ে। মার মুখ। ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে খেলার দিন। নিজের বিছানাটার কথা। পুরোনো শয্যায় ভীষণ আরাম আর ভালোবাসা জড়িয়ে থাকে। তখনই সেই চিন্তাটা মাথায় চমকে ওঠে—পালাতে

যাওয়া কি ঠিক হয়েছিল। আমি তো রাইফেলধারী সৈনিক নই। মিছিলে, সভায় হাজার মানুষ নিয়ে হৈচৈ করি। স্বস্তি পাই। হঠাৎ ওর মনে হয়, পুলিশের হাত থেকে পালাতে গিয়ে ও সাধারণ মানুষের থেকেও পালিয়ে এসেছে। এখন ও ভয়ানক একা, অসহায়। পকেটের রিভলভারটা খামচে ধরে। ভরসা পায় না। কি যেন একটা হারিয়ে ফেলার কষ্ট জাগে। ও আলো নেভায়। জানলা খুলে বিছানায় শোয়। বালিশ ভয়ানক নিচু। মাথাটা প্রায় বিছানায় ঠেকে। ঘুম আসে না। মিলির মুখটা বারবার মনে আসে। চেয়ারে ঝোলানো ব্যাগটা অন্ধকারে হাতড়ে নাকের কাছে ধরে। কোন গন্ধ নেই। বুকটা হু-হু করে। মিলিকে অনেক কথা বলার ছিল। বালিশটা নানাভাবে ঘুরিয়ে ঘাড়ের নিচে রাখে। কাজ হয় না, জল তেষ্টা পায়। উঠে আলো জ্বালায়। ঢকঢক করে জল খায়। হঠাৎ ভাবে, তোষকের মাথার দিকটা একটু মুড়ে নিলে হয়। তার ওপর বালিশ রাখলে শুয়ে আরাম হবে। তোষকটা ধরে ও ভাঁজ করে। অনেকটা গুটিয়ে যায়। তোষকের তলায় ওর চোখ পড়ে। নজর আটকে যায়। হৃৎপিণ্ডটা ছিটকে ওঠে। শুধু টাকা। নতুন একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল। চকচকে, তাজা, পিন আঁটা। তপুর মাথার ঘিলু বরফ হয়ে যায়। ও কুলকিনারা পায় না। তাকিয়ে থাকে। এক-একটা বাণ্ডিলে অন্ততঃ একশোটা নোট। মানে দশহাজারি বাণ্ডিল। ও গোনে দুই, পাঁচ, সাত, বারো, পনেরো। তোষকটা ওর অজান্তেই একটু করে উঠে যায়। কুড়ি। নাঃ। ও আর গুণবে না। তপু তোষকটা ফেলে দেয়। ঠিক আগের মতন। সটান পাতে। মাথার কাছে বালিশটা রাখে। বাইরে রিক্সার ঠুনঠুন শব্দ। কপালে মিনমিনে ঘাম। তপু হাতের পাতায় ঘাম মোছে। মনে পড়ে, কাগজে পড়া কয়েকটা ব্যাঙ্ক লুটের কথা। জগদীশদের বিপ্লবের তত্ত্ব—মানুষ, টাকা, বন্দুক। আগে চাই টাকা।

তপু আর বিছানায় শোয় না। চেয়ারে বসে। বরেনদার অসুখ। কাল একশো টাকার দরকার। তারপরও অনেক টাকা চাই। জেল

থেকে বন্ধুদের বার করার ছক ও ভেবেছে। অনেক মালমশলা লাগবে। নিখুঁত পরিকল্পনা আর নির্ভুল কাজের জন্যে টাকা চাই। অনেক টাকা। দোটানায় মাথাটা লণ্ডভণ্ড হয়। বরেনদার কথা মনে পড়ে। 'আমরা ডাকাত নই। জনগণ আমাদের টাকা দেবে।'

তপু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু বন্দুক ছিনতাই করাটাও তো ডাকাতি?'

'না, ওটা যুদ্ধের কৌশল'—জবাব দিয়েছিল বরেনদা—'ডিজআর্ম দ্য এনিমি এ্যাণ্ড আর্ম ইওরসেল্ফ। শত্রুর অস্ত্র তোমার অস্ত্র।'

কথাটা তপু ঠিক বোঝেনি। আজও বোঝে না। ওর নিজেকে আবার বড়ো একা মনে হয়। সব তত্ত্ব, নীতি কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একটার সঙ্গে আর একটা মেলে না। বেশি প্রশ্ন করার সুযোগও কমে যাচ্ছে। প্রশ্নের সঙ্গে সন্দেহ থাকে। সন্দেহ মানেই দুর্বলতা, ভয়। তপুর মনে এই সন্দেহ, ভয় জমেছে। পথে-ঘাটে সবাইকে এখন শত্রু মনে হয়। কুলি, মজুর, রিক্সাওয়ালা, ডাক্তার, কেরাণী সকলের চোখেই শত্রুতা। তপুকে ধরার জন্য ওরা যেন ওৎ পেতে আছে। দু-একটা এরকম ব্যাপার ঘটেছে। মাথায় গামছা বাঁধা মজুরগোছের গোটা তিনেক ছদ্মবেশী পুলিশ বৌবাজারে শেখরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেখর গত হপ্তায় ধরা পড়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অচেনা লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হলে তপু ঘাবড়ে যেতো। আজকাল চেনা লোককেও সন্দেহ হয়, ভয় করে। পার্টির বাইরে সবাই শত্রু। পার্টির মধ্যেও কিছুদিন ধরে শত্রুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়। ঘুম ছুটে গেছে। তপু চেয়ারে বসে থাকে। বাইরে অন্ধকার। পাশের ঘরে রমা ঘুমোচ্ছে। তপু ভাবে, তাকে জাগিয়ে এখনি চলে যাবে। ধরা পড়তে এখন আর ভয় নেই। মরতেও নয়। কিন্তু ডাকাত দুর্নামটা ও এড়াতে চায়। আজ রাতে যদি এখানে পুলিশ আসে, বামাল সমেত ওকে পায়, তাহলে

অবস্থা কি হবে? কেউ বিশ্বাস করবে না ওর কথা। ভাববে গোপন যোগসাজস ছিল। বরেনদাও তাই ভাববে।

অন্ধকার ঘরে ফাঁকা চোখে ও বসে থাকে। মিলি এখন কি করছে? মিলিও ভাববে, তপুদার যোগ ছিল। ভাববে কি? বড় আশ্চর্য মেয়ে। হুটহাট অনেক কথা বলে। সেগুলো অদ্ভুত সত্যি। একদিন বলেছিল, 'আপনারা যা করছেন, এরপর কেউ আপনাদের বন্ধু থাকবে না। আপনারা নিজেরাও মারামারি খেয়োখেয়ি করবেন।' কমলকে ভীষণ খেপাতো। কমল চটতো খুব। একদিন মিলি বললো, 'তোরা ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছিস।' আবৃত্তি করলো, 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হলো ব্যথা।'

অন্ধকার দেয়ালে পাখার ফিকে ছায়া ঘোরে। তপু ভাবে, মিলি কেমন করে গোটা ব্যাপারটা আগেভাগে জেনে যায়?

লেপের নিচে টাকার পাহাড় আগলে তপু যখের মতো চেয়ারে বসে থাকে। রাত আর কাটে না। বাইরে কুকুর ডাকে। তপু চমকে ওঠে। ভাবে—পুলিশ এলো। গাড়ি থামার শব্দ হয়। হৃৎপিণ্ড লাফায়। বোধ হয় পুলিশ ভ্যান দাঁড়ালো। ওর মাথাটা ক্রমশ বুঁদ হয়। ভারি হয় চোখের পাতা। চেয়ারের মাথায় ঘাড় নেতিয়ে পড়ে। আবছা তন্দ্রার মধ্যে রাত শেষ হয়। আকাশে আলো জাগে। তপু কাঁধে ব্যাগ ঝোলায়। রমার দরজায় টোকা দেয়। ঘুম চোখে রমা দরজা খোলে।

'চললুম।' তপু বলে।

'চা খাবেন না?'

'না।'

'দাঁড়ান টাকাটা দিই।'

'দরকার হবে না।' রমাকে অবাক করে তপু চলে যায়। রমা দেখে তপুর চোখ লাল। চোখের তলায় কালি। উস্কোখুস্কো চুল। এ যেন অন্য তপু।

রাস্তায় নেমে তপু ভাবে কাজটা কি ঠিক হলো? দশটার সময় পার্থ আসবে। টাকাটা চাই। তাড়াতাড়ি কোন একটা ডেরায় ঢোকা দরকার।

বালিগঞ্জ, ভবানীপুরে অনেক চেনা-জানা বন্ধু, দরদী ছিল। তপু তাদের মনে করার চেষ্টা করে। এখন সকলে ওদের ভয় পায়। এড়াতে চায়। অনেকের নাম মাথায় আসে। কিন্তু সেরকম যুৎসই একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে বসন্তদার বাড়ি যাবে। রাসবিহারীতে থাকে। বাড়িতে ফোন আছে। কিন্তু ওর ছোটভাই অন্য দলের কর্মী। বাবাও আর এক রাজনীতির লোক। তবু যেতে হয়।

বসন্তদা বাড়ি ছিল। সে নিজেই দরজা খোলে। বসন্তদা চোখে কম দেখে। কানে কম শোনে। ছেলেবেলায় পক্স হয়েছিল। তারই জের। চোখে রঙীন সানগ্লাস। বসন্তদা প্রথমটা তপুকে চিনতে পারে না। বেশ অনেকক্ষণ দেখে। তারপর প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরে। ফিস-ফিস করে বলে, 'এসো। ভেতরে এসো। সেই দুই শূয়োরের বাচ্চা বাড়িতে আছে।' বাবা আর ভাইয়ের কথা বলছে। রোগা পাত্‌লা চেহারা। উত্তেজনায় কাঁপে। 'শুনেছো, গণফৌজ তৈরি হয়েছে? রেডিও চালু হচ্ছে?' বসন্তদা জিজ্ঞেস করে। 'শূয়োরের বাচ্চাদের দিন শেষ।'

তপু কথা বলে না।

'জেল থেকে কমরেডদের ছিনিয়ে আনতে হবে'—বসন্তদা বলে—'আর্মস চাই। অনেক।'

'আপনি কেমন আছেন?' তপু প্রসঙ্গ বদলায়।

'ভালো। তবে অর্শের ব্লিডিং হলেই কাহিল হয়ে পড়ি।'

বসন্তদার সব কথা তপুর কানে যায় না। ও ভাবছে, টাকার

কথা। কার কাছে চাওয়া যায়? কে দিতে পারে?

‘শ-খানেক টাকা চাই।’ তপু বলে।

‘কখন?’

‘এখনি।’

‘সাড়ে দশটার আগে হবে না’—বসন্তদা জানায়—‘ব্যাঙ্ক খুলবে। তারপর। শূয়োরের বাচ্চাদের কাছে টাকা চাইবো না।’ তপু ভেবে যায়। মিলি পারে।

‘একটা ফোন করবো।’ তপু জানায়।

বসন্তদার সঙ্গে পাশের ঘরে যায়। নম্বর ঘোবায়। গলা শুনে বোঝে মিলি ফোন ধরেছে।

‘তপু বলছি।’

‘বুঝেছি। কেমন আছেন?’ মিলির গলায় খুশি চিকুর দেয়।

‘ভালো। একটা দবকার ছিল।’

‘বলুন।’ মিলির গলা নরম চিকন।

‘শ খানেক টাকা দরকার। এখনি।’

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া নেই।

‘হ্যালো, হ্যালো।’ তপু ডাকে।

‘কখন? কোথায়?’ মিলির গলা শুকনো।

‘নটা, সাড়ে-নটা নাগাদ লেনিনেব স্ট্যাচুর নিচে।’

‘আচ্ছা।’ একটা বিদঘুটে শব্দ করে ফোনটা বোবা হয়। আরো দু-চার কথা তপুর বলার ছিল। মাছের কাঁটার মতো সেগুলো গলায় বিঁধে থাকে।

তবু খানিক স্বস্তি। দশটায় ওখানেই পার্থর সঙ্গে দেখা করার কথা। সকালের দিকে ও জায়গাটার ভিড় বেশি, ভয় কম। তপুর ইচ্ছে হয় সাড়ে-নটা থেকে আধঘণ্টা ও মিলির সঙ্গে নরম ঘাসের ওপর বসে থাকবে। কথা বলবে। ওর বরফজমা বুক মিলির তাপে গন্ধে গলে যাক, মিলি বলুক, ‘এভাবে বিপ্লব হয় -না। ভুল হচ্ছে।

কোথাও একটা বড়ো গলদ রয়েছে।' বসন্তদা চা আনে। দুজনে চা খায়। বসন্তদা গড়গড় করে কথা বলে, 'আমাদের গাঁয়ে এক জোতদার আছে। প্রচুর জমি, টাকা। সাতকুলে কেউ নেই। ব্যাটা মহা কঞ্জুস আর ধড়িবাজ। বাড়িতে একটা দোনলা বন্দুক আর আমেরিকান রিভলভার আছে। এ্যাট ইজ ছিনতাই করা যায়।'

তপু শোনে। জিজ্ঞেস করে, 'আপনি সঙ্গে থাকবেন ?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে যাবো।'

'কবে ?' উৎসাহে বসন্তদা লাফায়। 'আজ রাতে ঠিক করবো।'

লেনিনের স্ট্যাচু থেকে সামান্য দূরে তপু দাঁড়িয়েছিল। এটা ওর স্বভাব। ঠিক করা জায়গায় কখনো বেশিক্ষণ দাঁড়াতে নেই। বিপদ ঘটে। অফিসের সময়। সকলে ব্যস্ত। ছুটছে। ঘামছে। ফিরে তাকানোর সময় নেই। তপু দেখে। সেই প্রশ্নটা মাথায় হুল ফোটায়। এতো বড়ো যুদ্ধ হচ্ছে অথচ মানুষজন কেন এতো নির্বিকার উদাসীন ? সবাই কি সুখে আছে ? যুদ্ধ চায় না ? রক্ত অশান্তি ঘেন্না করে ? কিছুদিন ধরে এই ভবনাগুলো ওর মাথায় ঘুরছে। মানুষ কি চায় ? কিভাবে চায় ? ও ভাবে। জবাব পায় না।

সাড়ে-নটার কিছু পরে মিলি আসে। স্ট্যাচুর কাছে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। তপু দেখে মিলির মুখ রোদে লালচে। কুচো চুল কপালে, কানে ছড়িয়ে আছে। চাঁপা রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। কপালে বড়ো টিপ। পাকা তরমুজের ফালির মতো ঠোঁট। হঠাৎ ওর বরেনদার কথা মনে পড়ে—এসব কাজে মেয়েদের লাগাও। সঙ্গে-সঙ্গে মণ্টুর মন্তব্য—চাবির গোছাটা হাতালেই চিচিং ফাঁক।

তপুকে দেখে মিলি বলে, 'একটু দেরি হলো।'

'অসুবিধে হয়েছে কিছু ?' তপু জানতে চায়।

'কাল রাতে বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। বাবা খুব আপসেট। টাকাটা চাইতে পারলুম না।'

তপু ভেঙে পড়ে। 'তাহলে—!'

মিলি হাতের বটুয়া খোলে। তপু দেখে অনেকগুলো একশো টাকার নোট।

'এতো টাকা কোথায় পেলে?' গত রাতের কথা মনে পড়ে।

'একটা হার বেচে দিলুম'—মিলি বলে—'পড়ে ছিল। কাজে লাগতো না।'

একটা নোট ও এগিয়ে দেয়।

'আর দরকার?' জিজ্ঞেস করে।

তপুর মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করে। বলে, 'চলো, একটু বসা যাক।'

'কোথায়?'

তপু কার্জন পার্কের দিকে আঙুল দেখায়। দুজনে বসে। সেই মিষ্টি গন্ধে তপুর বুক ভরে যায়। 'কিছু কথা আছে'—তপু বলে। মিলি সাড়া দেয় না। তপুর ভেতরে কে যেন চেঁচায়—'ওসব কথা মিলিকে বলে না। তপু ঠোঁট কামড়ায়। শুরু করে—'যারা জেলে আছে, তুমি নিশ্চয় তাদের মুক্তি চাও।'

মিলি তাকায়। বলে, 'চাই।'

'তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

'আমি কি সাহায্য করবো? আমি উকিল নাকি?'

চারপাশে গনগনে রোদ। শুধু এই গাছতলায় একমুঠো ছায়া। তপু তার পরিকল্পনা বলে যায়। মিলির মুখের রং বদলায়। অসহায়, বিপন্ন, তীব্র আলোড়ন। 'তুমি তো কমলের বোন হিসেবে ইণ্টারভ্যু পাবে'—তপু বোঝায়—'সেই সুযোগে দু-একটা খবর দেওয়া-নেওয়া, জেল গেটের ডিউটি অফিসার, জমাদারের সঙ্গে একটু খাতির জমানো এই আর কি।'

মিলির মুখে কোন রেখা নেই এখন। ও ভাবছে। তপু হঠাৎ ওর একটা হাত নিজের দু-হাতে টেনে নেয়। বলে—'আমি পাথর নই। বিশ্বাস করো।' মিলির নরম হাত ওর মুঠোয় কাঁপতে থাকে।

মিলি সরায় না, মিলির হাত ঠাণ্ডা নয়। গরমও নয়। ধরা পড়ার কুসুম-কুসুম নম্রতা জড়িয়ে থাকে।

'হাত ছাড়ো'—মিলি ফিসফিস করে—'কে না কে দেখবে।'

তপু কথা শোনে, হাত সরায়। ওর হাত তখন ঠাণ্ডা পাথর।

পার্থকে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু ও টুঁ শব্দ করে না। টাকাটা পকেটে রাখে। বলে, 'বরেনদা জিজ্ঞেস করেছে, এদিকের কাজ কতদূর?'

'এগোচ্ছে। অনেক টাকার দরকার। আর্মস চাই।'

'টাকা উঠছে'—পার্থ জানায়—'কাল পরশু এসে যাবে।'

নির্জন রেড রোড ধরে ওরা হাঁটে।

'শংকর আর বাদল কাল রাতে মারা গেছে।' পার্থ জানায়।

তপু সাড়া দেয় না। মনে-মনে হিসেব করে কতোজন বন্ধু আজ পর্যন্ত ও হারিয়েছে। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। পার্থ হঠাৎ বলে—'এসব কাজে মেয়েদের লাগানো ঠিক নয়।'

তপু চমকায়। 'বরেনদা তো বলেছে,' ও তাকায় পার্থর দিকে। পার্থ জবাব দেয় না। 'তুই পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে কথা বলছিস'—তপুর গলায় ঝাঁঝ।

'জানি'—পার্থ নিচু গলায় বলে—'এর জন্যে আমাদের হয়তো মরতেও হবে।'

একটা চাপা কান্না তপুর গলায় জমে ওঠে। বলে—'না। তা কেন।'

রাস্তায় নেমে ওরা দুজন একটা বাসে ওঠে। বারোটার সময় বিজুর সঙ্গে দেখা করার কথা। পার্থই ঠিক করেছে। একটু আগেই ওরা বিজুর আস্তানায় হাজির হয়।

বিজুর বয়েস বছর পঁচিশ। কটা রং। মুখে ছোপ-ছোপ দাগ। রোদে পুড়ে তামাটে। কদমছাঁট চুল। স্ট্যালিনের মতো ঝোলা গোঁফ। দেখলে মনে হয় কতো যেন বয়েস।

'এসো ওস্তাদ'—বিজু ডান-হাতটা এগিয়ে দেয়। তপু ধরে। ঝাঁকানি দেয়। ডান-হাতে তিনটে আঙুল। বাকি দুটো বোমা বাঁধবার সময় উড়ে গেছে। তিনটে আঙুল যেন তিনটে লোহার শিক। তর্জনীর নখ নেই। হাড় আর মাংস জমে মুখের কাছটা নরুনের মতো ছুঁচলো। ওই আঙুল দিয়ে একবার কার পেটে খোঁচা মেরেছিল। পেট ফুঁড়ে দিয়েছিল আঙুলটা। সে-এক রক্তা-রক্তি কাণ্ড।

একটা বিড়ি ধরিয়ে বিজু বলে, 'ঘুমে চোখ বুজে আসছে। কাল রাতে একটা মড়া পোড়াতে গিয়েছিলুম।'

'এখনও এসব চালাচ্ছিস।' পার্থ খোঁচা দেয়।

'সেইজন্যে টিঁকে আছি আজ পর্যন্ত'—বিজু বলে—'এসব হলো সোস্যাল ওয়ার্ক। এই মড়া পোড়ানো, বস্তির ঝগড়া মেটানো, লোকের বিপদে-আপদে একটু এগিয়ে যাই বলে কোন শালা আমাকে পাড়া থেকে উৎখাত করতে পারে নি।' বিজু ঘন ঘন বিড়িতে টান দেয়। একটা নেড়ি কুত্তা এসে ওর প্রায় কোলের ওপর শুয়ে পড়ে। বিজু তার পিঠ চাপড়ায়। বলে, 'কেমন আছো ভাগ্নে?' কুকুরটা কুঁই-কুঁই করে। তপুই শুরু করে কথাটা, 'তোর বাবার লেদের কারখানায় কয়েকটা মাল বানিয়ে দিতে হবে।'

'কি? গ্রেনেড?' বিজুর গলার স্বর বদলায়। চোখের মণি ঘুরতে থাকে।

'হ্যাঁ।'

'কোথায় এ্যাক্‌শন?'

'ঠিক সময় জানাবো'—তপু বলে—'তোকেও থাকতে হবে।'

বিজু ঘাড় নাড়ে। কুকুরটার ঘন হলুদ লোমে পোকা খোঁজে। জানায়—'আমি রাজী।'

বিজুর বাড়িতে ওরা দুপুরে খায়। সারা দুপুর কথা হয়। এক সময় তপু ঘুমিয়ে পড়ে।

পার্থর কাজ ছিল। সে চলে যায়। তপুকে জাগায় না।

বিকেলে তপুর যাওয়ার সময় বিজু বলে, 'ওস্তাদ, আমায় গণফৌজে পাঠিয়ে দাও। এসব আর ভালো লাগে না।'

তপু হাসে। জিজ্ঞেস করে, 'ভাগ্নে কোথায় থাকবে?'

বিজু বলে, 'ওকে নিয়ে যাবো। মামা-ভাগ্নে যেখানে, বিপদ নেই সেখানে।'

বসন্তদা সকালেই বলেছিল, 'সোজা আমার ঘরে চলে আসবি। কড়া টড়া নাড়ার দরকার নেই। শূয়োরের বাচ্চারা শুনতে পাবে।' সন্ধ্যার একটু আগে তপু বসন্তদার ঘরে ঢুকলো। ঘরের মধ্যে ছেঁড়া-ছেঁড়া অন্ধকার। জানলার ওপাশে একটা ঝাঁকড়া নিমগাছ। দুটো শালিখ পাখি ডাকছে। ঘরের মাঝখানে বসে বসন্তদা বেহালা বাজাচ্ছিল। চোখে সেই রঙীন সানগ্লাস। বড়ো বিষণ্ণ একটা সুর। বসন্তদা বাজনায় ডুবে গেছে। তপু চুপচাপ বসে থাকে। থেঁতো-হওয়া পিয়ানো একোর্ডিয়ানের স্বপ্নটা বুকে রক্ত ছড়ায়। একসময় বাজনা থামে। তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। তপু গলায় শব্দ করে।

'কে!'—বসন্তদা চমকে ওঠে।

'আমি, তপু।'

'তাই বলো। কতক্ষণ?'

'মিনিট দশেক'—তপু জবাব দেয়।

'ডাকলে না কেন?'—বসন্তদার গলায় অনুযোগ—'এইসব বুর্জোয়া ভাইসের প্রশ্রয় দিও না।' তারপর যোগ করে—'যেদিন অর্শের ব্লিডিং হয়, বড়ো ক্লান্ত লাগে, তখন ওটা বাজালে একটু আরাম পাই।'

বসন্তদা আলো জ্বালায়, হ্যাঙারে ঝোলানো পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে। বলে—'ধরো।'

'আর দরকার নেই'—তপু জানায়।

'তবু রাখো।' টাকাটা প্রায় জোর করেই তপুর পকেটে গুঁজে দেয়।

রাতে খাওয়ার পর কথা হয়। বসন্তদা খুঁটিনাটি সব খবর জানায়। 'লোকটার নাম কাশীনাথ আদক। ডাকসাইটে জোতদার, মহাজন। সারের ব্যবসা আছে। বার-তুয়েক বিয়ে করেছিল। একটা বউও টেঁকে নি। মরে গেছে। বয়েস প্রায় ষাট। শোয়ার ঘরে মাথার কাছে বন্দুকটা টাঙ্গানো থাকে। রিভলবার থাকে বালিশের তলায়। লোকটার বদমেজাজের জন্মে আত্মীয়-স্বজনরাও ঘেঁসে না। বাড়িতে ঝি-চাকর আছে। স্রেফ প্রাণের ভয়ে কাজ করে। তবে কাগজের রিপোর্টারদের খুব খাতির করে ও। প্রায়ই তু-একজন রিপোর্টার ওর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা-ফুর্তি মেরে আসে।'

'মাল তুটো কিভাবে হাতানো যায়?' তপু জানতে চায়।

বসন্তদা মাথা চুলকোয়। বলে, 'মাঝরাতে কেউ ওর বাড়ির সদর দরজা খুলে দিলে আমরা ঢুকতে পারি।' তপু ভাবে। জিজ্ঞেস করে—'আমি যদি রিপোর্টার সেজে ওর বাড়িতে উঠি, কেমন হয়?'

বসন্তদা ফেটে পড়ে। বলে, 'ফাইন! চমৎকার। কিন্তু সাবধান। লোকটা মহা খচ্চর। সাংঘাতিক হাতের তাক। ফস্কায় না। বাড়ির পোষা মুরগিকে তু-ঠ্যাং বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে গুলি করে। হাত পাকায়। তারপর খায়।'

কাশীনাথ আদকের বাড়িতে হানা দেওয়ার প্ল্যান পাকা হয়। হাসনাবাদের কাছাকাছি গ্রামে কাশীনাথ আদকের বাড়ি। তপু আগামীকাল ওর চেনা এক সাংবাদিকের নাম ভাঁড়িয়ে চিঠি লিখবে। সামনে হপ্তায় একটা দিন ওরা যাওয়ার জন্মে ঠিক করে। কথার ফাঁকে দেওয়ালে টাঙ্গানো বেহালাটার দিকে বসন্তদা তু-একবার তাকায়। রাত বাড়ে।

সকাল ন'টা নাগাদ পার্থ আসে। বলে, 'একটা ভাল মালের খবর আছে। পয়েণ্ট টু-ফাইভ ওয়েভারলি স্কট। মেড ইন ব্রিটেন।'

'তুলে নে'—তপু জানায়।

'অনেক টাকা চাইছে।'

'কতো?'

'বারোশো। আটশো পর্যন্ত জোগাড় করা যায়।'

বসন্তদা শুনছিল। বললো—'আমি শ' দুই দিতে পারি। ব্যাংকে আর নেই।'

তপু পকেটের যন্ত্রটা ছোঁয়। সাধারণ পিস্তল। ওর পছন্দ নয়। তবু ঐ লোহার টুকরোটা কয়েক ঘণ্টা পকেটে থেকে কি-এক নেশা ধরিয়েছে। আরো কেতাদুরস্ত, জোরালো একটা অস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসে।

'কার জন্যে'—জানতে চায় তপু। 'গ্রামে যাবে।'

বসন্তদা হঠাৎ বলে—'আমার বেহালাটা বেচে দাও। এ্যাট ইজ দুই পাওয়া যাবে।' ওরা জবাব দেয় না। দুটো চড়ুই ঘরের মধ্যে ফুরুৎ-ফুরুৎ উড়ে বেড়ায়।

'আর দুই আমি জোগাড় করছি'—তপু উঠে দাঁড়ায়—'কিন্তু মালটা আমি নেবো।'

পার্থ তাকায়। তপু বলে—'আমারটা গ্রামে পাঠিয়ে দে।'

তপু আবার ফোন করে মিলিকে। 'শ' দুয়েক টাকা দিতে পারো?'—মিলির কথা শুনে ও ছুঁড়ে দেয় কথাটা।

'কি হবে?'—মিলি জিজ্ঞেস করে।

'দরকার আছে, এলে বলবো।'

লেনিনের স্ট্যাচুর নিচে বিকেল পাঁচটায় সময় ঠিক হয়।

'ভালোই হলো'—পার্থ বলে—'মালটা ওই পাড়াতেই লেনদেন হবে। সন্ধ্যে সাতটায়।'

'বরেনদা কেমন?'—তপু জিজ্ঞেস করে।

'আপাতত ভালো।'—পার্থ জানায়।

তারপর বলে—'গতকাল বিহার, অন্ধ্র, পাঞ্জাবের নেতারা এসেছে।

দারুণ খবর। ঝড়ের বেগে কাজ হচ্ছে। শত্রুরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে।'

'কমরেড পঞ্চাদ্রির কি খবর?'—তপু জিজ্ঞেস করে।

'মারা গেছে।'

'সুব্বা রাও?'

'মারা গেছে।'

তপুর ভেতরটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এতো জয়, এতো সাফল্যের খবর। তবু সেগুলো যেন হাওয়ার মতো। ধরাছোঁয়া যায় না। পাশাপাশি মৃত্যুগুলো কি জলজ্যান্ত খাঁটি।

'বরেনদা কাল একটা খুব দামী কথা বলেছে', পার্থ জানায়—'এটা আত্মরক্ষার যুগ নয়, আত্মত্যাগের যুগ। ভয় পেলে চলবে না। এই হেডিংয়ে এক লাখ লিফলেট ছাপানো হচ্ছে।'

বসন্তদা কথাটা বারকয়েক বিড়বিড় করে। কণ্ঠস্থ করে নেয়।

বসন্তদার বাড়ির একতলায় তখন হুল্লোড়। আজকের কাগজে বসন্তদার ছোটভাই-এর ছবি বেরিয়েছে। এক মন্ত্রীর পাশে গতকাল এক সভায় ও সুযোগমতো দাঁড়িয়েছিল।

তেতো গলায় বসন্তদা চেঁচিয়ে ওঠে—'শূয়োরের বাচ্চা।'

পার্থ চলে যায়। দশটা নাগাদ বসন্তদা রওনা হয় ব্যাঙ্কের দিকে। তপু একা বসে থাকে। নানাভাবে জেল ভাঙ্গার ছকটা মনে-মনে তৈরি করে। প্রতি শনিবার ইণ্টারভিউ। গেটের অফিসে অনেক বন্দী আসে। আত্মীয়স্বজনদের ভিড় হয়। ভেতরের দরজার একচিলতে সারা বিকেল খোলা থাকে। গোপনে খবরটা দিয়ে ভেতরের সবাইকে তৈরি রাখতে হবে। চাবি-সেপাইকে বশ করা চাই। তা না-হলে লোকটা বেঘোরে মরবে। গ্রেনেড ফাটবে। দু'-চারজন পিস্তল নিয়ে খাড়া থাকবে। বাইরে স্টার্ট নিয়ে থাকবে গোটা চারেক গাড়ি। তারপর মুক্ত এলাকা, গণফৌজ। কম ঝঞ্ঝাট, কম রক্তপাত। গোটা পাঁচ-সাত ভালো বোরের রিভলবার আর পিস্তল রাখা দরকার। আর চাই কেজি দশেক লাল-শাদা, মানে মোমছাল, পটাস। ও দুটো

জিনিস অঢেল মেলে। এখন তো প্রায় রোজই পাঁচ-সাত কেজি দরকার হয়। গ্রেনেডের খোলগুলো যেন মজবুত হয়। ঢালাই ভালো না হলে হাতে ফাটবে। ফিউজ লাগানোতেও নানা কায়দা আছে। মণ্টু আর বিজুর পাকা হাত। তপু চিন্তা করে না। চাবি-সেপাইকে মিলি যদি কব্জা করতে পারে, তাহলে দারুণ হয়। মিলি কি পারবে না? এই চিন্তাটা মাথায় আসার সঙ্গে-সঙ্গে বুক জ্বালা করে।

ভেতর থেকে কে যেন বলে—'মেয়েটাকে রেহাই দাও। নরম, নিষ্পাপ মেয়েটার বিশ্বাসের সুযোগ নিও না।'

তপুর অস্বস্তি হয়। বসন্তদার একটা বই নিয়ে পাতা ওল্টায়। হেরম্যান হেসের 'ডেমিয়ান'। বেশ ভালো গল্প। একটা জায়গায় ওর চোখ আটকে যায়। বড়ো সাংঘাতিক একটা লাইন। 'মানুষকে শেষপর্যন্ত নিজের কাছে ফিরে আসতে হয়।' সব প্রশ্ন, দুর্বলতা ডেমিয়ান ফুঁ দিয়ে ওড়াতে চেয়েছিল। বেপরোয়া জীবন ভালো লাগতো তার। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারে নি। নিজের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। সবাইকে দাঁড়াতে হয়।

পকেটের শক্ত জিনিসটা তপু খামচে ধরে। ভাবে, আমাকেও কি নিজের সামনে দাঁড়াতে হবে?

গড়িয়ার মনু গুপ্তের মুখটা ওর মনে পড়ে। মাস-দুয়েক আগের ঘটনা। কলেজ স্ট্রীট এলাকায় হঠাৎ বিজনের সঙ্গে দেখা। তখনও ট্রামে-বাসে অফিসযাত্রীর ভিড়। কলেজ, য়ুনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা ফুটপাথ জুড়ে আড্ডা মারছে। সবে বেলা এগারোটা। আকাশে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ।

বিজু হিসহিস করে—'একটা প্রাইভেট গাড়ির দরকার।'

বিজুর সঙ্গে ও প্রেসের পেছনের সরু গলিতে গিয়ে দাঁড়ায়। বিজু ব্যাপারটা খোলসা করে—'আজ মনুকে টেমার লেন থেকে ধরেছি। গড়িয়ায় ও আমাদের চারজন কমরেডকে খুন করেছে।'

'মন্নু কোথায় ?'—তপু জিজ্ঞেস করে।

'ক্লোরাফর্মে অজ্ঞান হয়ে আছে।'

'ওকে নিয়ে কি করবি ?'

একটা প্রাইভেট গাড়িতে তুলে দমদমে পাঠাবো। সেখানে সিদ্ধান্ত হবে।

তপু কি বলবে ভেবে পায় না। মন্নু চারজনকে খুন করেছে। ওর ভয়ে পার্টির বহু ছেলে পাড়ার বাইরে। সেই মন্নু এখন ওদের মুঠোয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের পেছনে দারোয়ানদের একটি খালি ঘরে বিপুল আর শঙ্করের পাহারায় মন্নু আছে।

'পার্থ কোথায় ?'—তপু জিজ্ঞেস করে।

'ও এখন পার্টির দপ্তরে। ওর তাত্ত্বিক বুকনিতে মাথা ধরে।'—বিজু বলে।

মহাজাতি সদনের সামনে একটা মোটর গ্যারেজের কাছে বিজু দাঁড়ায়। বলে—'তুই কথা বল। আমাকে এরা চেনে।' জখমি হাতটা ও পকেটে গুঁজে রাখে।

গ্যারেজের অফিসে ঢুকে তপু গাড়ির ব্যাপার পাকা করে। বিয়ে বাড়ি বলতে বাড়তি ভাড়া হাঁকে। ঘণ্টায় দশ টাকা। তপু তাতেই রাজি হয়। গ্যারেজ মালিক এডভান্স চাইলে তপু বিপদে পড়ে। বলে—'বাড়ি গিয়ে দেবে।'

তপুর নিরীহ, সরল মুখ দেখে মালিক দ্বিতীয়বার ভাবে না। তার ওপর পাড়ার বিয়ে। তপু মির্জাপুরের একটা ঠিকানা দিয়েছে। দশ মিনিটের মধ্যেই একটা ভালো এ্যাম্বাসাডারে বিজু আর তপু হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের দরজায় এসে নামে। ল-কলেজের সুবাদে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের একটা ঘর বেশ কয়েকবছর বিপুলের দখলে আছে। কলেজ স্ট্রিটে এই ঘরটা প্রায় পার্টির হেড কোয়ার্টার। বিপুল নিজে অনেকবছর সে-ঘরে যায় নি। এখন পুলিশ ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

বেশ জাঁদরেল চেহারার মোচওয়ালা হিন্দুস্থানী ড্রাইভার কেমন এক সন্দেহের চোখে তপু আর বিজুকে দেখে জিজ্ঞেস করে—'এখানে কি কাম?'

'বন্ধুদের নেবো।' বিজু বলে। তপুকে গাড়িতে বসিয়ে ও ভেতরে যায়। দু-মিনিট পরে বিজু এসে ড্রাইভারের পাশে বসে। চোখের ইসারায় তপুকে ও ভেতরে যেতে বলে। দারোয়ানের ঘরে অন্ধকার মেঝেতে মন্নু শুয়ে আছে। একতলায় মানুষজনের সাড়া নেই। উঠোনে কয়েকটা কাক, চড়াই ডাকাডাকি করে। একফালি রোদ জলের পাইপে লেগে আছে। য়ুনিভার্সিটিতে ঘণ্টার শব্দ। বিপুল পা দিয়ে মন্নুর মুখটা সোজা করার চেষ্টা করে। তপু দেখে মন্নুর কপালে কালশিটে, নাকের তলায় রক্ত। ধোলাই হয়েছে। বিপুল বলে—'আর দেরি নয়। চটপট গাড়িতে তোল।' তিনজনে হাত লাগায়। শঙ্করের কাঁধে এয়ার ব্যাগ। বিপুল বলে—'আমরা পেছনে বসবো।'

সামনে বিজু।

মন্নুকে গাড়ির কাছে আনলে ড্রাইভার চমকে ওঠে। নিজের কোমরে ঠেকানো বিজুর যন্ত্রটা দেখে টুঁ শব্দ করে না।

ড্রাইভারের কানের কাছে মুখ এনে বিপুল বলে—'হুঁশিয়ার। বেগড়বাঁই করলে মারা পড়বে।' পেছনের সিটের তলায় মন্নুর শরীরের ওপর পা রেখে তপু, বিপুল আর শঙ্কর বসে। গাড়ি স্টার্ট নেয়। তপু বুঝতে পারে স্টিয়ারিং-এ ড্রাইভারের হাত কাঁপছে। কাঁধের ব্যাগ খুলে শঙ্কর বিপুলের হাতে দুটো পেটো দেয়। তপুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে—'তুমি তো গুরু গ্রেনেড্ মাস্টার। তোমাকে এমার্জেন্সিতে কাজে লাগাবো।'

কলেজ স্ট্রিটের দিকে গাড়ির মুখ ছিলো।

বিজু বলে—'সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু ধরে দমদম।' অনেক কষ্টে ড্রাইভার গাড়ি ঘোরায়। ড্রাইভারের কোমরে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বিজু

তার সঙ্গে গল্প করে। দেশ, ঘরের খবর নেয়। বিহারে এবছর কেমন গম হয়েছে, তার হিসেব। ড্রাইভার ফ্যাকাসে মুখে ঘাড় নাড়ে। কলুটোলা আর সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর মোড়ে ট্রাফিকের জন্যে গাড়ি দাঁড়ায়। তপুর মনে হয়, পায়ের তলায় মনু জেগেছে। বিপুল বলে—'শালার জ্ঞান ফিরেছে।' শক্ত পায়ে মনুর মাথাটা শঙ্কর গাড়ির মেঝেতে চেপে রাখে।

'শূয়ারটা ছটফট করছে।'—শঙ্কর বলে।

বিজু হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে মনুকে দেখার চেষ্টা করে। এক পলকের অমনোযোগ। ঠিক সেই সুযোগে ড্রাইভার ধাঁ করে গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় নেমে দৌড় দেয়। তার গলায় বিকট চিৎকার। ট্রাফিক পুলিশ চমকে উঠে একটানা বাঁশিটি ফুঁকতে থাকে। রাস্তার সব-দিকের গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। তপু দেখে তাদের গাড়ির পেছনেও গাড়ির লাইন। পায়ের নিচে মনু হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। বিপুল বলে—'তপু চেপে রাখ।'

তপু তার পায়ের পাতায় মনুর বুকের ধুকধুক শব্দ ধরতে পারে। শঙ্কর হঠাৎ মনুর মাজায় একটা জোর লাথি কসায়। মনু সাড়া দেয় না।

গাড়ির সামনের দরজা খুলে বিজু নেমে পড়ে। 'পুলিশ আসছে'—ও জানায়।

'এ শালার কি হবে?' মনুকে দেখিয়ে বিজু জিজ্ঞেস করে। পেছনের দরজা দিয়ে তখন শঙ্কর, তপু আর বিপুল রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির ভেতর এখন শুধু মনু। হয়তো ওর জ্ঞান ফিরছে। পেছনে লাইনবন্দী গাড়ি। সকলেই হর্ন বাজাচ্ছে। খালি গাড়িটির পেছনের খোলা জানলা লক্ষ্য করে শঙ্কর হঠাৎ একটা পেটো ঝাড়ে। কানে তালা ধরানো শব্দ হয়। তারপর এক নাগাড়ে গোটা দশেক বোমা পড়ে। গাড়িটা ভেঙ্গে-তুবড়ে চৌখুপ্পি হয়ে যায়। পেছনের গাড়ি-গুলোতেও মানুষজন নেই। বোধহয় সকলেই গাড়ির মধ্যে সিটের

তলায় কোলকুঁজো হয়ে বসে আছে। সোশ্যাল সায়েন্সের দরজা দিয়ে হলুদ বাড়িটায় ঢোকার সময় তপু দেখে কলেজ ষ্ট্রীটের মুখে পুলিশ বাহিনী পজিসন নিয়েছে। সোশ্যাল সায়েন্সের চত্বর দিয়েই ওরা হার্ডিঞ্জে পৌঁছে যায়।

শঙ্কর বলে—মন্নুটা কি মরেছে?

কিমা হয়ে গেছে—বিপুল জবাব দেয়।

ও মরার জিনিস নয়—বিজু বলে।

ওরা চারজন কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিলো না। হার্ডিঞ্জের পশ্চিম কোণে একটা অন্ধকার ঘরে বিকেল পর্যন্ত কাটলো। এইভাবে অগোছালো কাজ করা ঠিক নয়—তপু ভাবে। কিন্তু কথাটা বিজুকে বলতে পারে না।

পরদিন সব সংবাদপত্রের পয়লা পাতায় খবরটা ছাপা হয়। মন্নু গুপ্ত বেঁচে আছে। ওর একটা পা বাদ দিতে হয়েছে। পুলিশের কাছে ও আক্রমণকারীদের নাম বলেছে। কাউকে এখনো ধরা যায় নি। জোর তদন্ত চলছে।

এতো হুল্লোড় আর ঝড়ের মধ্যেও পুলিশ তপুর হদিশ পায় নি। অনেক কাল সে পিছলে থেকেছে। কিন্তু কি লাভ? বিশ্ববিদ্যালয় লনে মারামারি থেকে মন্নু গুপ্তকে ল্যাংড়া করে দেওয়া পর্যন্ত পুলিশ তার হদিশ পায় নি। এখন পেয়েছে। কিন্তু মন্নুকে কে খোঁড়া করলো? শঙ্কর, বিজু, বিপুল অথবা ইতিহাস? তপু বুঝতে পারে না ইতিহাস কোথায় তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু ইতিহাস তো শেষ কথা নয়। ইতিহাসে ব্যক্তিরও ভূমিকা আছে। তাই সব মানুষকেই নিজের কাছে ফিরে আসতে হয়। ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বড়ো জটিল। সেখানে কোন ভেজাল বা রফা চলে না। তপু জানে, অনেক প্রশ্নকে সে জুতোর তলায় পিষেছে। ভেবেছে, সেগুলো তার মধ্যবিত্ত দুর্বলতা, পুরুষানুক্রমিক বেইমানির বিষ। সে কোন দিন পাত্তা দেয় নি ওগুলোকে। নিজের বিছানায় না শুলে ঘুম হয়

না। এটা ক্রিমির অভ্যেস। পায়খানা ছাড়া তাদের কিছু রোচে না।

সুন্দরী মেয়ে দেখলে প্রেমে পড়াটাও কুত্তাসুলভ ব্যাপার। লেখাপড়া, চাকরি, বিয়ে, বৌকে আদর, ক্রমাগত শুয়োরের বংশবৃদ্ধি—এই তো জীবন। এ-জীবনে তার ঘেন্না। মানুষ আরো কিছু চায়। মহৎ, পবিত্র, সজ্বারামে বেঁচে থাকার মতো একটা কিছু।

বসন্তদা ফেরে। তপুর হাতে দুশো টাকা দেয়। রোগা শরীরে ঢলঢলে পাঞ্জাবী। মনে হয় হ্যাঙ্গারে টাঙ্গানো। বলে, আমিও ভাবছি গ্রামে চলে যাবো। আমারও কিছু করার আছে। এটা আত্মত্যাগের যুগ। আমার চোখ, কান দুটোই নষ্ট হয়ে গেছে। আর অর্শের কষ্ট। তবু একবার লড়ে যাবো।

সারা দুপুর বিছানায় শুয়ে তপু ছটফট করে। 'ডেমিয়ান' শেষ হয়েছে। মাথায় চিন্তা জট পাকায়। এখন রাস্তায়, বাসে সব সময়ে একটা আতঙ্ক মনে চাপ বেঁধে থাকে। যে-কোন মুহূর্তে একটা বুলেট ওর বুক বা মাথা ফুটো করে দিতে পারে। তারপর ও নেই। এটা ঠিক ভয় নয়। আর কিছু। লড়াই-এর মাঠে ঢাল-তলোয়ার হারিয়ে একজন সৈন্যের মনে যে-কষ্ট জাগে, অনেকটা তাই। অস্ত্র-শস্ত্রে মোড়া শত্রুবাহিনীর সামনে খালি হাতে দাঁড়ানোর যন্ত্রণা। অভিমন্যুর বোধহয় এরকম হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে পঞ্চাদ্রি আর সুব্বা রাও-এর মৃত্যুর খবর। কেউ জানলো না। শুনলো না। পৃথিবী, চারপাশের মানুষ কি উদাসীন, নিরুত্তাপ। অথচ মানুষের জন্যেই ওরা জীবন দিয়েছে। মানুষকে ভালোবাসতে চেয়েছে। নতুন কিছু গড়ার প্রশ্ন ছিল ওদের। তাহলে কি ওরা মানুষের কেউ ছিল না? মানুষ কি ওদের ত্যাগ করেছিল? তপুর বুকে সেই কষ্টটা শিরশির করে। মানুষের থেকে বোধহয় অনেক দূরে সরে গেছে ও। দুটো অস্ত্র আর দু-চারশো টাকার জন্যে কোন দেশের বিপ্লবীদের এমন ভিখিরির মতো অবস্থা হয় না। মানুষের আকাজ্ক্ষার সঙ্গে থাকলে মানুষই রসদ জোগায়। চিরকাল এই হয়েছে।

বরেনদা বলেছে—'মানুষ এগিয়ে আসবে। উজাড় করে দেবে নিজেদের। একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বালো। ঢেউ তোলো একবার।' কিন্তু এতো জীবন গেলো, রক্ত বইলো, মানুষ আসে না কেন? মানুষ কি পাথর? শালগ্রাম শিলা? বোধহয় বরেনদার কথাই সত্যি। এটা শহরের মানুষের শ্রেণীচরিত্র। তারা ধান্দাবাজ, ভীতু, পাল্লা ভারী না দেখলে এগোয় না। তারা লম্বা-চওড়া কথা বলে। কাজের সময় পালায়। এরা হচ্ছে কেন্নো। সুযোগ পেলে লম্বা হয়। ভয়ের ব্যাপার থাকলে এরা কুণ্ডলী পাকায়। গণফৌজ আর মুক্ত এলাকার খবর পেলে এরা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো পাছা গুটিয়ে ছুটে আসবে। জয়ধ্বনি দেবে।

বরেনদা যখন এসব কথা বলে, তপুর বুকে কি এক লজ্জা ছড়িয়ে পড়ে। নিজের দিকে তাকাতে পারে না। সেও শহরের জীব। ছেলেবেলায় গাঁয়ে ছিল। তারপর শহরবাসী, দলের অধিকাংশ ছেলেই তাই। বরেনদার কথাগুলো ওকে গরম শিকের ছ্যাঁকা দেয়। জমে-থাকা প্রশ্নগুলোকে ও তখন ঝেড়ে ফেলে। পিষে মারে। সেই গণফৌজ আর মুক্ত এলাকা এখন আর স্বপ্ন নয়। ভারতবর্ষে নতুন যুগ শুরু হয়েছে। তবে মানুষ এখনো এতো অসাড় কেন? কেউ খুন হলে প্রতিবাদ করে না। রাস্তায় পড়ে-থাকা ডজন-ডজন বেওয়ারিশ লাশের খবর কাগজে বেরোয়। মানুষ পড়ে। চুপ করে থাকে। দেশটা কি কেন্নোর রাজত্ব হলো? চারটে নাগাদ তপু বেরোয়। তখনও খটখটে রোদ। রাস্তায় কাদাকাদা পিচ। বসন্তদার বাড়িতেই এখন ক'দিন থাকবে। ওর বাবা নামী উকিল। টাকাকড়ি আছে। দু-ভাই-ই বেকার। কাজের দরকারও নেই। বসন্তদা ওর বাবাকে কয়েকবার চাকরির কথা বলেছিল। বাবা রাজী হয় নি। উত্তর দিয়েছে—তোকে কে চাকরি দেবে? কথাটা বসন্তদার লেগেছিল—জবাবে বলেছিল—'হাত থাকলে কানা-কালারও চাকরি হয়।'

পাঁচটার কিছু আগে মিলি এলো। চোখ ধাঁধানো সাজ।

'এতো সেজেছো কেন ?' তপু জিজ্ঞেস করে—'তোমার জন্যে ধর পড়ে যাবো।'

মিলি একটু থতমত খায়। বলে—'বাড়িতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাতাহারির মহড়া দিচ্ছি।' তপুর মুখ কালো হয়। মিলি হাসে। বলে—'দামী কাপড়গুলো এখন বার করছি। এই প্রথম ঠোঁটে-মুখে রঙ লাগালুম। তা না-হলে হঠাৎ দাদাকে দেখতে যাওয়ার সময় ভোল বদলালে পাঁচজনে সন্দেহ করবে।'

কথাটা ঠিক। মিলি বিষয়টা নিয়ে ভেবেছে। কিন্তু তপুর ভেতরটা গুটিয়ে যায়। মনে হয়, মিলি যেন দূরে সরে যাচ্ছে। পর হয়ে যাচ্ছে। হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে।

মিলি নিচু গলায় বলে—'নরেন, বিলু আর হিমাদ্রিকে আজ সকালে সিঁথির লোকেরা পিটিয়ে মেরেছে।'

তপু চমকে ওঠে। মিলির দিকে তাকায়।

'ওরা দাদার বন্ধু। আমাদের বাড়িতে কতোবার এসেছে।' কথাগুলো মিলি যেন নিজেকে শোনায়। সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। রাজভবনের সিংহের কেশর লাল। তপু তিনজনকেই চেনে। ওর মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। বলে—'সিঁথির লোকেরা নয়। পুলিশের যোগসাজসে এটা গুণ্ডা-বদমাশদের কাজ।'

'হয়তো।' মিলি মন্তব্য করে—'কিন্তু যারা মানুষের সেবা করে, মানুষের জন্যে কাজ করে, তাদের বাঁচাতে কেউ এগোলো না কেন? ওরা তো পাড়ারই ছেলে।'

তপুর মনে পড়ে বরেনদার কথা—'জনগণ হচ্ছে জল। বিপ্লবীরা মাছ। জনগণ তাদের বাঁচিয়ে রাখে।' তাহলে এটা কেন হলো? তপু বিষয়টা আর ভাবতে চায় না।

বলে—'টাকাটা দাও।' মিলি টাকা দেয়, জিজ্ঞেস করে—'কি হবে ?'

'একটা রিভলবার কিনবো। ব্রিটিশ মেক। দারুণ মাল।'

মিলির মুখ মেঘলা হয়ে যায়। কি একটা বলার জন্যে উশখুশ করে। বলে না। উঠে দাঁড়ায়। তপু বলে—'কমলের সঙ্গে কবে ইণ্টারভিউ?'

'বোধহয় পরশু। শনিবার।'

'ওকে বলো, জেল থেকে বার করার কাজ চলছে।'

মিলি চলে গেলে তপুর মনে হয়, আজ মিলির কাছে ও যেন কি পেলো না। ঘাসের ওপর চিত হয়ে ও শোয়। অন্ধকার নামছে। ও আকাশ দেখে। আকাশে একটা তারা। তপু ভাবে, মিলির শরীরের সেই হাল্কা মিষ্টি গন্ধটা কোথায় হারিয়ে গেল।

অন্ধকার ঘন হলে তপু কার্জন পার্ক থেকে বেরোয়। ট্রাম গুমটির ঘড়িতে তখন সাতটা বাজতে দশ। ঢিমে পায়ে মনুমেণ্টের দিকে এগোয়। পার্থ এসে গিয়েছিল। মিনারের রকে বসে ভাঁড়ে চা খাচ্ছিল। তপুকে জিজ্ঞেস করলো—'খাবি?'

'না। পার্টি কোথায়?'

'এখানেই আসার কথা। টাকা রেডি?'

তপু ঘাড় নাড়ে। সাতটার দু' পাঁচ মিনিট বাদে লম্বা কালো একটা লোক আসে। পার্থকে বলে—'চলুন।'

'কোথায়?'

'মেট্রো গলির মধ্যে। দিলরুবা রেস্টুরেণ্টে। মাল আর মালিক ওখানে আছে।'

আলোয় এসে তপু দেখলো, লোকটা চোয়াড়ে, ট্যারা চোখ।

মেট্রোর তলায় এসে লোকটা বললো—'আসুন, আসুন।'

পার্থ বিব্রত হয়। তপু অবাক।

লোকটা তাড়া দেয়—'দেরি হলে পার্টি ভাগবে। আপনারা নেহাত ছকুবাবুর লোক—।'

পার্থ আটশো টাকা এগিয়ে দেয় তপুকে। বলে—'আমি মনুমেণ্টের তলায় থাকছি।'

তপু ট্যারা লোকটার সঙ্গে কেবিনে ঢোকে। ভেতরটা ফাঁকা। কেউ নেই।

'ডেকে আনছি।, লোকটা উধাও হয়ে যায়। রেস্টুরেণ্টটা বাইরে থেকে মন্দ নয়। শৌখিন শেডে আলো লাগানো। দেয়ালের প্লাস্টিক রঙ। মোটা পর্দা ঢাকা তিনটে কেবিন। দেওয়ালে গুরু গোবিন্দ সিং আর হেমা মালিনীর ছবি। আলো একটু কম। ছায়াবাহারি ব্যবস্থা।

ট্যারা লোকটা ফেরে। পেছনে আর একজন। এ লোকটা বিশেষ লম্বা নয়। গায়ের রঙ ফরশা। দামী শার্ট ট্রাউজার্স। চুলে অনেকগুলো ঢেউ। আঁচড়াতে সময় লাগে। বছর ত্রিশ বত্রিশ বয়েস। লোকটা তপুর পাশে চেয়ারে বসে। তপু ভেতর দিকে সরে যায়। ট্যারা লোকটা এখন নেই। লোকটা পকেট থেকে জিনিসটা বার করে। কুণ্ডলী পাকানো কালো সাপ যেন। তপু হাতে নেয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। লোকটার দিকে তাকায়। চোখে চোখ মেলে। লোকটা হাসে। দু চোখে সাপ হিলহিল করে।

'টাকাটা দিন। তাড়াতাড়ি।' লোকটা বলে।

তপু টাকা বার করে। লোকটা বাঁ হাতে টাকা নেয়। টাকাটা পকেটে রাখে। তপু তাকায়। লোকটার ডান হাতে একটা রিভল-ভার। তপুর কপালে প্রায় ছুঁয়ে আছে। সদ্য কেনা রিভলভারটা লোকটা টেবিল থেকে বাঁ হাতে তুলে পকেটে ঢোকায়।

নিচু, কড়া গলায় বলে—'আওয়াজ নয়। মটকা বিলা হয়ে যাবে।' তপু পুতুলের মতো বসে থাকে। রিভলভারটা সেইভাবে উচিয়ে লোকটা আস্তে আস্তে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তপু এক লাফে বাইরে আসে। কেউ নেই। গোটা গলিটা ও পাগলের মতো বার কয়েক চক্কর দেয়। লোকটা নেই। ট্যারা লোকটাও হাওয়া। তপুর মনে হয়, কেউ যেন ওকে দেখছে। এখানে অনেক খোঁচর থাকে। এখনি একটা গুলি ওর মাথা ফুটো

করে দেবে। লজ্জা, রাগ, হিংসেয় ওর বুক রি-রি করে। রাস্তা পেরিয়ে অন্ধকারে আসে। কতো মানুষ। হিজিবিজি ভিড়। নিজের জন্যেই ওর মায়া হয়। আমি কতো নাদান। পৃথিবীটার কতো কম জানি।

তপুর দেরি দেখে পার্থ ভয় পেয়েছিল। মনুমেণ্ট থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল। এটা নিয়ম। কেউ ধরা পড়লে তার জানা ডেরা আর ঘাঁটিগুলো সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হয়। কেননা পুলিশের কাটাছেঁড়ার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকে বলে ফেলে, স্বীকারোক্তি দেয়। তাই রোজ পার্টির কিছু শেলটার হাতছাড়া হয়। নতুন জায়গার খোঁজ চলে। বড়ো নেতাদের নিয়ে বিপদ বেশি। কেন না পার্টির ভাঁড়ারের সব খবর তাদের জানা। তপু দেখে পার্থ নেই। এক সেকেণ্ড মাত্র। অন্ধকার ফুঁড়ে পার্থ হাজির হয়। পার্থ দেখে তপুর মুখ শুকনো, গম্ভীর। 'কি ব্যাপার ?'—পার্থ জিজ্ঞেস করে। তপু মাথা নিচু করে। তারপর ঘটনাটা বলে। পার্থ টাকে হাত বোলায়। অন্ধকারে ওর মুখ ভালো দেখা যায় না। চোখ নাকের ডগাটা জেগে থাকে।

নিচু গলায় ও বলে—'ছকুবাবুর বারোটা বাজাবো।'

'ছকুবাবু কে ?'

'সোনাগাছির দালাল। বাড়িওয়ালা। লাল-শাদা বেচে।'

তপু ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তাকিয়ে থাকে। পার্থ পরিষ্কার করে—'আমাদের পাশের পাড়ায় ছকুবাবু থাকে। এই ট্যারা লোকটা একদিন গিয়েছিল ছকুবাবুর কাছে। কি একটা কথা ঘ্যান ঘ্যান করছিল ছকুবাবুর কানে। ছকুবাবু পরে আসতে বললো। তখন লোকটার সঙ্গে আমার দেখা। জিজ্ঞেস করলুম, কি ব্যাপার ? লোকটা মালের খবর দিল। বললো—ছকুবাবু নাকি তার কাস্টমার।'

'জিজ্ঞেস করেছিলি ছকুবাবুকে ?' তপু প্রশ্ন করে।

'না।'

'তোর বয়েস কতো ?'

পার্থ ঘাবড়ে যায়। বলে—'তেইশ।'

'আমার চব্বিশ।' তপু যোগ করে। 'তোর চেয়ে একটু বেশি জানি। তোর ছকু ওই লোকটাকে হয়তো চেনে না।'

পার্থ কথাটা আমল দেয় না। বলে—'আর্মারি লুঠতে হবে।'

সারা সকাল কাটলো পার্টির কাগজ আর কয়েকটা দলিল পড়ে। আগে রুদ্ধশ্বাসে পড়তো এসব। আজকাল কেমন একঘেয়ে, জোলো লাগে। পাতার পর পাতা আন্তর্জাতিক খবর। তারপর খানিকটা নিরর্থক, রাজনৈতিক কচকচি। এক পাতা সাফল্যের ফর্দ। ভবিষ্যতের কাজ-কর্মের নির্দেশ। গতমাসে কাগজের দপ্তরে পুলিশ তালা দিয়ে গেছে। কাগজ বেরোয় গোপনে। বোধহয় সেজন্যেই কাগজটা এমন রক্তহীন, ফ্যাকাসে। কেনে অনেকে। পড়ে দু-পাঁচজন। খতমের তালিকাটা ফি হপ্তায় লম্বা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে গরীব কৃষকরা রক্তচোষা জোতদারের গলা কাটছে। জোতদারের নাম ঠিকানা। মরার সময় তার আর্তনাদ, কৃষকের ফেটে-পড়া আনন্দের ধারাবিবরণী। তপুর গা শিরশির করে। খুনের খবর যে এভাবে ছাপা যায়, এটা তার ধারণা ছিল না। কোথায় কোন্ অচেনা গ্রামে এক অচেনা জোতদার মারা পড়লো, তাতে তার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু সে ভাবে, ওই লোকটাকে মারার কি খুব দরকার ছিল? ওই ঘটনায় পর গ্রামের গরীব মানুষের দুঃখ কি ঘুচেছে? শুধু ভাঙ্গলে চলবে না। গড়াব কাজেও হাত লাগানো চাই। এই ডজন ডজন জোতদার খতমের মধ্যে দিয়ে কি গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। কাগজ পড়তেই তাই ভালো লাগে না। নিছক অভ্যেসে পাতা ওল্টায়।

পার্থ এলো সন্ধ্যার পর। আজ বড়োবাজারে লাল-শাদা তুলতে যাওয়ার কথা। দশ কেজি করে দু রকমের মাল বিজুর কাছে পৌঁছোতে হবে। বিজু আর মন্টু কাল থেকে হাত লাগাবে কাজে।

গোটা দশেক গ্রেনেড। দু ডজন পেটো।

পার্থ একটা প্রাইভেট গাড়ি এনেছিল। ড্রাইভার ছিল গাড়িতে। লোকটা কথা বলছিল না। ওরা দুজন পেছনের সিটে বসেছে।

'কার গাড়ি?' তপু জিজ্ঞেস করে।

'জজ সাহেবের।' পার্থ জানায়—'ওর ছেলেকে বলে নিয়ে এলুম।'

পার্থ নিচু গলায় একটা নতুন পরিকল্পনায় কথা বলে। 'ফোর্ট উইলিয়ামে ঢুকতে হবে। কোনো অসুবিধে নেই। যোগাযোগ বরেনদার। ভেতরের স্টোরে লোক আছে আমাদের। হরলিক্স-এর গাড়িতে সাপ্লাই যাবে কাল। হরলিক্স নামানো হলে খালি কার্টনের মধ্যে কয়েকটা মাল তুলে দেবে আমাদের লোক। গেটে এমনিতে চেক হয় না। হলেও অসুবিধে নেই। কালকে যে সেন্ট্রি ডিউটিতে থাকবে সে ওই স্টোরকিপারের বন্ধু। তোকে হরলিক্স এর ভ্যানে থাকতে হবে।'

তপু ব্যাপারটা বুঝে নেয়। জিজ্ঞেস করে—'ভ্যানের ড্রাইভারকে জানানো হয়েছে?'

'না। সে তোকে আকাশবাণীর তলা থেকে সকাল ন'টায় তুলে নেবে। তুই হচ্ছিস স্টোরকিপারের মাসতুতো ভাই। কেল্লা দেখতে যাচ্ছিস।'

'প্ল্যানটা কার?' তপু জানতে চায়।

'বোধহয় বরেনদার। ঠিক জানি না।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে পার্থ ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দেশ দিচ্ছে। ডান দিকে। এবার বাঁ দিকে। কলাকার স্ট্রীটে একটু অন্ধকার দেখে পার্থ গাড়িটা দাঁড় করায়। গাড়ির পেছন থেকে দুটো দশ কেজি ডালডার টিন বের করে।

দুজনে দুটো টিন নিয়ে এগোয়। রাস্তায় চারপাশে নজর চালিয়ে তপু হাওয়া বোঝে। তারপর দোকানে ঢোকে। দোকানের মালিক ওদের দুজনকেই চেনে।

বাচ্চু'—পার্থ ডাকে।

একটা কমবয়েসী ছেলে আসে। ·টিন ছুটো নিয়ে ভেতরে যায়। পার্থ টাকা দেয়।

'মালে ভেজাল থাকছে।' পার্থ বলে।

'সে কি?' মালিক ভয় পায়।

'শাদায় টোয়েন্টি পার্সেণ্ট মুন।' পার্থর গলা রুক্ষ—'আপনার বাজে মালের জন্য পরশু আমাদের এক কমরেড মারা গেছে। পেটোটা লোকটার মাথায় লাগলো ফাটলো না। তার হাতে রিভলবর ছিল। অখিল মারা গেল।'

মালিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বাচ্চু টিন ছুটো নিয়ে আসে। দোকান ছাড়ার আগে পার্থ বলে—'মাল খারাপ হলে, এবার আপনাকে ভুগতে হবে।'

লোকটার মুখ ফ্যাকাসে। পার্থ আর তাকায় না।

গাড়ির ক্যারিয়ারে টিন ছুটো রেখে ওরা পেছনে বসে। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে। ওরা এখন চুপচাপ। ড্রাইভার মাঝে মাঝে আয়না দিয়ে কি যেন দেখছে। উশখুশ করছে।

'কি ব্যাপার?' পার্থ জিজ্ঞেস করে।

'একটা প্রাইভেট পেছনে লেগেছে।' ড্রাইভার জানায়।

ওরা ছুজনে পুতুলের মতো বসে থাকে। টিনে কি আছে—ড্রাইভার জানতে চায়।

'ঘি।' পার্থ বলে।

'তবে আর ভয় কি'—ড্রাইভার অভয় দেয়—'একটু মজা করা যাক।'

এই মজার ঝোঁকেই সে পেছনের গাড়িটার চোখে ধুলো দেয়। তপু ঘামছিল। কপালের ঘাম মোছে। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে আরাম হয়। বৌবাজারের কাছে একটা ফাঁকা ট্যাকসি পায়। গাড়িটা ছেড়ে ওরা ট্যাকসি ধরে।

বিজুর ডেরায় ওরা পৌঁছল রাত ন'টা নাগাদ। বিজু অপেক্ষা করছিল। গ্রেনেডের খোলের নমুনা দেখালো। স্প্রিং ফিউজ্ লাগাচ্ছে এবার, সে কথা জানালো। জিভের ডগায় লাল-শাদা ছুঁয়ে চেখে দেখলো।

'মাল ঠিক আছে।' বিজু বললো।

'শনিবার চাই তপু জানালো।'

বিজু হিসেব করলো—'মানে আটদিন।' '

'মণ্টুও কাল থেকে হাত লাগাবে।' পার্থ জানালো।

পরদিন অনেক সকালে পার্থ এলো। মুখ গম্ভীর। বললো—'পুলিশ আমাদের সব খবর জেনে যাচ্ছে। কাল অল্পের জন্যে বরেনদা বেঁচেছে।' তপু খোঁচায় না। ও নিজেও জানে। ওর তিনটে আশ্রয়ের খোঁজ পুলিশ পেয়েছে। হানা দিয়েছে। সে-সব জায়গায় আর ঢোকার উপায় নেই। যারা ধরা পড়ার দু'একদিনের মধ্যে জামিন পাচ্ছে, তাদের কাছ থেকেও অনেক খবর আসছে। পুলিশ প্রায় সকলের গোপন নাম জানে। নিষিদ্ধ দলিল ইস্তাহার পার্টি মহলের সকলের হাতে যাওয়ার আগে পুলিশ পেয়ে যায়। এমন কি গোপন সভায় আলোচনার হুবহু বিবরণ পুলিশ জানতে পারে। তপু বোঝে পুকুর জোড়া জালটা গোটানো হচ্ছে। সমস্ত মাছ একদিন ধরা পড়বে।

'প্রণব ধরা পড়েছে। পরশু রাতে।' পার্থ জানায়।

তপুর বুকটা ধক্ করে ওঠে। আরো কিছু শোনার জন্যে ও তাকায়। পার্থ টাকে হাত বোলায়।

বলে—'রমা বলছে, তুই নাকি পুলিশকে খবর দিয়েছিস।'

তপুর কথা আটকে যায়। বুকে কষ্টটা টন-টন করে।

'অবশ্য প্রণবের বাড়ি থেকে পুলিশ কিছু পায় নি।' পার্থ যোগ করে—'ও মুখে যতোই আমাদের দলের কথা বলুক, আসলে ও ডাকাত পার্টির লোক।'

চণ্ডীতলায় একটা বাড়িতে মণ্টুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। পার্থ করেছিল। দুজনে সেখানে পৌঁছে মণ্টুর সাড়া পেলো না। বাড়ির একজন বললো—পায়খানায় ঢুকেছে অনেকক্ষণ। বেরোচ্ছে না। খোঁজ—খোঁজ। একটু পরে খাটা পায়খানার তলা থেকে মণ্টু বেরিয়ে এলো। কাঁধে মাথায় ময়লা গন্ধ বেরোচ্ছে।

তপুকে দেখে হাসলো। বললো—পালাবার রাস্তাটা তৈরি রাখছি। এ বাড়ি থেকে পালানোর ওই একটাই জায়গা।

পার্থ নাক টিপে তাড়া দিল—ধুয়ে আয়।

বিজুর ডেরা মণ্টু চেনে। পার্থ ওকে সেখানে যেতে বললো।

ওদের বেরোনোর মুখে মণ্টু জানালো—একটা ভাল মালের হদিশ আছে। তুলবি নাকি?

ওরা দাঁড়ায়। 'কি মাল?' পার্থ জিজ্ঞেস করে—'কতো চাইছে?'

'ওয়েবারলি স্কট্। ব্রিটিশ মেক্।'—মণ্টু জবাব দেয়—'বারো গজ লাগবে।'

পার্থ আর তপু। চোখে চোখে তাকায়। তপু পকেটের যন্ত্রটা ছোঁয়।

'কবে পাওয়া যাবে?' পার্থ জিজ্ঞেস করে।

'আজ সন্ধেবেলায়। এসপ্ল্যানেডে এপয়েন্টমেণ্ট।'

'নেবো।' তপু বলে—'সাতটায় পার্থ টাকাটা নিয়ে স্টেটসম্যানের তলায় থাকবে।'

'পাকা?'

'হুঁ।'

মণ্টু যায় বিজুর কাছে। তপু আর পার্থ বাসে ওঠে।

'সেই লোকটাই।' তপু বলে—'আজ ওকে ফাঁসাবো। তুই একা যাবি। আমি আড়াল থেকে নজর রাখবো।'

রাস্তায় অফিস যাত্রীরা বেরিয়েছে। ভিড় বাড়ছে। আজ মিলি জেলে কমলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তপু ঠিক করেছে রাতের

দিকে একবার মিলির সঙ্গে ফোনে কথা বলবে। কোন খবর থাকলে শুনবে। মিলিকে এখন রোজ একবার জেলে পাঠানো দরকার। হপ্তায় একদিন দাদার সঙ্গে নিয়মমতো দেখা করলে কাজ এগোবে না। গেটের দু-চারজন 'ভাইটাল' লোককে যদি ও হাত করতে পারে! নিশ্চয়ই পারবে। ওর রূপ, চোখ, মুখ, শরীরের ওই জাদুকরী মিষ্টিগন্ধে মিলি দুনিয়া জয় করতে পারে। কিন্তু বুকের মধ্যে খোঁচাটা থেকে যায়। যদি মিলির কোন ক্ষতি হয়, মিলি মারা পড়ে? মিলির জন্যে তার এতো চিন্তা কেন? বাজে, ফালতু ব্যাপার। কতোজন মারা পড়েছে, নিখোঁজ হয়েছে। মিলিও সে-রকম একজন। কিন্তু বুকের কষ্টটা কমে না। ও নিজেকে বোঝায়। এসব নিয়ে তুমি ভেবো না। এসব পুতুপুতু ভাব-ভালোবাসায় গলে যাওয়া তোমার সাজে না। ঝেড়ে ফেলো মিলিকে। মিলি কিছু নয়। এক তাল রক্ত মাংস। আর পাঁচজনের মতো। কিন্তু মন বিফল হয়।

ধর্মতলা থেকে পায়ে হেঁটে ওরা আকাশবাণীর তলায় আসে। তপু পকেটের যন্ত্রটা পার্থকে দেয়। বলে—'সন্ধ্যেবেলায় নেবো।' তারপর হঠাৎ যোগ করে—'আমি আর শহরে থাকবো না। মুক্ত এলাকায় চলে যাবো।'

পার্থ এক পলক তাকায়। বলে—'মুক্ত এলাকা কোথায়?

'সে কি?' তপু অবাক।

'আমি আর কথা বলবো না।' পার্থ ফিস্‌ফিস্ করে—'এর পর মার্ডার হয়ে যাবো।'

তখনও ন'টা বাজে নি। চারপাশে চনমনে রোদ। আকাশবাণীর সদর থেকে একটু দূরে তপু একলা দাঁড়িয়ে থাকে। পার্থর কথাটা ওর মাথায় বিঁধে থাকে। মুক্ত এলাকা নেই। তবে এ-সব কি হচ্ছে? জেল ভেঙ্গে কিছু ছেলেকে বার করে কি লাভ? কে তাদের দায়িত্ব নেবে। রাস্তায় ঘাটে কুকুর বেড়ালের মতো গুলি খেয়ে মরে থাকবে তারা! পার্থ এখন বরেনদার সবচেয়ে কাছের লোক। কিন্তু ওর

এতো ভয় কেন? তপুর মাথাটা দপদপ করে। মিলি নেই, আত্মীয় বন্ধুরা নেই। চারপাশে ফাঁকা ধূ ধূ করছে। একটা ধারালো কান্না ওর বুকে পাক খায়। পর পর গাড়ি ছুটে যায়। মানুষ-জন নিশ্চিন্তে গল্প করে, অফিস যায়। সবকিছু জমজমাট্ ভরপুর। অথচ ওর একি হাল হয়েছে।

হরলিক্স্-এর একটা ভ্যান উল্টোদিকে থামে। রাস্তা পেরিয়ে তপু সামনে যায়। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে—'স্টোরকিপার গোপাল-বাবুর ভাই আপনি?' তপু ঘাড় নাড়ে। দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে। পেছনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে। সময় কম। ভ্যানটা স্টার্ট নেয়। রেড রোড ধরে এগিয়ে চলে।

কেউ কথা বলে না। তপুর বুকের মধ্যে কোন এক অদৃশ্য ফাটল থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়ে। চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। একটু পরেই তপু গুছিয়ে নেয় নিজেকে। চিন্তাগুলো পর পর সাজায়। কিছুদিন ধরে পার্থ বদলাচ্ছে। ওর মাথায় কেমন যেন একটা চোরা ব্যঙ্গ। বিশ্বাসের ভিতকে ভেতর থেকে সেটা গলিয়ে দেয়। ওর অনেক কথা পার্টি লাইনের সঙ্গে মেলে না। শুরুতে ছিলো খতম বিরোধী। নানা গ্রুপের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যোগাযোগ রাখতো। তপুকেও জানাতো না। শেষে পিকিং রিভিউ পড়ে ও পার্টিতে এলো। কম কথা বলে। সব শুনে নেয়। এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে ও জড়ায় নি। পুলিশ ওকে খোঁজে না। অথচ অনেক ভারি ভারি কাজ ও'করে বেড়ায়।

গোপন সংগঠন ও বোঝে। পার্টিতে ওর অন্য নাম। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র কারণ? ও কি করে বরেনদার এতো কাছে গেল? ওর বুদ্ধি আছে। ভালো ইংরিজি লেখে। ইংরিজি চিঠি-পত্র, পার্টি সার্কুলার খসড়া করে। অথচ সেগুলো মানে না, বিশ্বাস করে না। রূপসকুন্তী, মাগুরজানে গণফৌজ মার্চ করছে। সকলে

জানে। শত্রুদের কাগজেও সে খবর আছে। সি. আর. পি-র আটটা বন্দুক একদিনে তারা কেড়েছে। পার্টির ইংরিজি কাগজে খবরটা বেরিয়েছিল। সে খবর পার্থর লেখা। বন্দুক দখলের মধ্যে দিয়ে গণফৌজের জন্ম হলো—এ সার্কুলারটাও ওর তৈরি। তবু পার্থ অন্য কথা বললো।

চারপাশে কি যেন এক ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠেছে। পার্থ বরেনদাকে ওষুধ দেয়, সেবা করে। বরেনদার সব গোপন খবর ওর জানা। অথচ আড়ালে সন্দেহ ছড়াচ্ছে। তপুর বুকের নিঃশ্বাস পাথর হয়ে যায়।

গাড়ি ছুটছে। সবুজ ঘাসের ওপর একপাল ঘি রঙের ভেড়া। মুখ গুঁজে ঘাস খাচ্ছে। লাল উর্দিপরা এক আইসক্রীমওলা হলুদ রঙের গাড়ি রেখে জিরোচ্ছে।

বরেনদাকে শত্রুরা ঘিরেছে। তপুর ভেতরে একটা পোকা ছটফট করে। বরেনদা ওসব জানে না। কিন্তু পার্থ বরেনদাকে ধরিয়ে দিচ্ছে না কেন? ওকি সময় খুঁজছে? গোটা জালটা এক-সঙ্গে গুটোতে চাইছে? পার্থ চিরকাল এই রকম। কোনো কমিটমেণ্ট নেই। দায়-দায়িত্ব নেই। অথচ নৈবেদ্যের কলা হয়ে আছে। কিছুতেই ওর গায়ে আঁচ লাগে না। ব্যাপারটা জলের মতো সোজা। অথচ এতোদিন ও ধরতে পারে নি।

গোপালবাবু পাশ নিয়ে ঢোকাতে পারতেন আপনাকে।' ড্রাইভার বলে—আমাদের কোম্পানির গাড়িতে পাশ লাগে না।'

তপু শোনে। সাড়া দেয় না। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে। বুকে, পিঠে ঘাম জমে। রেড রোড ছেড়ে ডানদিকের রাস্তায় গাড়িটা ঘোরে। ফোর্টে ঢোকার পথ। রাস্তাটা খানিকটা পাতালমুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোর্ট উইলিয়মের সেন্ট্রি পোস্টের সামনে গাড়ি দাঁড়ায়। চারপাশে ঘন সবুজ গাছ। গাড়িটা এক সেকেণ্ড থামে। সেন্ট্রি দেখে। তারপর হাত নেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। তপু একটা আলাদা জগতে চলে আসে।

এ যেন লুই ক্যারলের এ্যালিস্ ইন দ্য ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড। ডানদিকে ওয়াচ্ টাওয়ার। পরিষ্কার, চওড়া রাস্তা। নির্জন। সার সার বাড়ি। তারপর পার্ক। হস্পিটাল। কিছুদূর অন্তর মিলিটারি চৌকি। নজর রাখছে তারা। ড্রাইভার কথা বলে যায়। একবার একটা চোর ঢুকেছিল। কিছু কার্তুজ নিয়ে পালাবার সময় ধরা পড়ে। তাকে গুলি করে মারা হয়। নিজের চোখে দেখা। অবশ্য আমার গাড়ি আজ পর্যন্ত একবারও তল্লাসী হয় নি। কোম্পানির সুনাম। হপ্তায় দশ কার্টুন হরলিকস আসে। প্রতি কার্টুনে একশো চুয়াল্লিশ। তাহলে হিসেব করুন মাসে কতো লাগে। লোকটা অনর্গল কথা বলে। তারপর গান ধরে—'এমন দিন কি হবে মা তারা।'

গাড়ি স্টোরে এসে দাঁড়ায়। ড্রাইভার মাল খালাস করে। তপু একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন অচেনা অল্পবয়সী লোক; চোখে সোনার তারের চশমা, মাথাভর্তি টাক এগিয়ে আসে। 'আমি গোপাল।' লোকটা নিচু গলায় জানায়।

'আমি আপনার মাসতুতো ভাই।' তপুও সেই স্বরে বলে।

লোকটা হাসে। 'মাল রেডি।' সে ফিস্ফিস্ করে—'কিন্তু আজ হাওয়াটা ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। পোস্টে সেণ্ট্রি বদলেছে। কি করবেন?'

তপু বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—'কেন?'

'ঠিক বলতে পারবো না। তবে ইনটেলিজেন্সের একজনকে আজ সকালে হঠাৎ দেখলুম।'

তপু বলে—'আপনি যা ভালো বোঝেন।'

লোকটা কি ভাবে। তারপর ভেতরে চলে যায়। তপুর শরীর ঘামে ভিজে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। হাড়, মজ্জার শীত-শীত ভাব। ঘোড়াটা পার্থকে দিয়ে এসেছে। তবু ভেতরে একটা কাঁপুনি লাগে।

মাল নামানো শেষ হয়। ড্রাইভার একটা বিড়ি ধরায়। গোপালবাবুকে বলে—'ভাইকে ভেতরটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান।'

গোপালবাবু একটু ভাবে। তারপর জানায়, 'আজ আর হলো না। বড়ো অফিসাররা এসেছে। খুব ব্যস্ত। পরে একদিন দেখাবো। তুমি ওকে ধর্মতলায় ছেড়ে দিও।'

ড্রাইভার অবাক হয়। গোপালবাবু তপুকে বলে—'আজ আর হলো না। আর একদিন সময় করে চলে এসো।'

তপু ঘাড় নাড়ে। গোপালবাবু সোনালী ফ্রেমের আড়ালে চোখ টেপে।

ভ্যানটা চলতে শুরু করে। সেণ্ট্রি পোস্টের কাছে আসতে প্রায় জনা তিনেক উর্দিপরা জওয়ান একসঙ্গে হাত তুলে গাড়িটা দাঁড় করায়। তপুর বুক হিম হয়ে যায়। ড্রাইভারের মুখে আতঙ্ক। দু-পাশের গাছপালা হাওয়ায় শিরশির করে। একজন ওদের গাড়ি থেকে নামতে বলে। দরজা খুলে সিট্ সরিয়ে গাড়িটা ওরা তন্নতন্ন করে খোঁজে। ড্রাইভারের লাইসেন্স, ব্লু বুক দেখে। দুজনকে ল্যাংটো করে তল্লাসি চালায়। কিছু মেলে না।

তাদের চোখ-মুখ নির্বিকার, তেলতেলে। 'এ কৌন হ্যায়?' তপুকে দেখিয়ে একজন জানতে চায়। ড্রাইভারের তখন অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। বলে—'কোম্পানীর আদমী।'

উর্দিপরা লোকগুলো নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলে। তারপর ড্রাইভারকে যাওয়ার হুকুম দেয়। ড্রাইভার ইঞ্জিনে স্টার্ট দেয়। স্টিয়ারিং-এ হাত কাঁপে। জিজ্ঞেস করে—'কি ব্যাপার বলুন তো?'

তপুর কণ্ঠনালীটা জ্বলছিল। জবাব দেয় না।

তপু যখন বসন্তদার বাড়ি ফিরলো, তখন আর কিছু ভাবার মতো অবস্থা নেই। মাথাটা বিলিয়ার্ড বলের মতো শক্ত। মুক্ত-অঞ্চল নেই, মিলি নেই, ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যেকার উর্দিপরা মানুষগুলোর ঠাণ্ডা

চোখ সব তাল পাকিয়ে গেছে। বসন্তদা বেহালার ছড়ে মোম ঘষছিল। রঙীন চশমায় দুটো চোখ ঢাকা। বড় করুণ সে দুটো চোখ। বসন্তের গুটির দাগ আছে চোখের জমিতে। মনে হয় পিঁপড়েতে খেয়ে গেছে। হলদে ঘায়ের মতো দুটি মণি। তপুর পায়ের শব্দে বসন্তদা তাকায়। ছড় আর মোম সরিয়ে রাখে। তপুকে দেখে হালচাল বোঝার চেষ্টা করে। তপু বলে— আমি চান করবো। শরীর পুড়ে যাচ্ছে।'

মাথায় বুকে তপু বালতি বালতি জল ঢালে। ঠাণ্ডা জল শরীরে হাত বোলায়। কি আরাম। শরীরের ভেতরটা পর্যন্ত ওর ধুয়ে নিতে ইচ্ছে করে। সফরের ধাক্কায় স্নায়ু শিরায় চিড় ধরেছে। রগে জ্বালা। আমার মিলি, আমার মুক্ত-এলাকা, গণফৌজ, সবাই আছে। পার্থর কথা আমি বিশ্বাস করি না। পার্থ বেইমান। সন্দেহ ছড়াচ্ছে।

দুপুরে খাওয়ার পর বসন্তদা জিজ্ঞেস করে—'আমাদের ওদিকে কবে যাবে?'

তপু এক সেকেণ্ড ভাবে। বলে—'পরশু সকালে। মন্টু আর বিজুকে নিয়ে যাবো। প্রথমে উঠবো আপনার বাড়ি। তারপর আমি একা যাবো কাশীনাথ আদকের গ্রামে। তার বাড়িতে ঢুকবো। লোকটার সঙ্গে ভাব জমাবো। মাঝরাতে আপনারা তিনজন আসবেন। একটা আওয়াজ দেবেন। আমি দরজা খুলবো।'

বসন্তদা মন দিয়ে শোনে। তারপর মুখের ওপর দু-হাত জুড়ে আওয়াজ করে—কুচ কুচ কুচ।

'ভাল্লুকের ডাক।' বসন্তদা বলে—'রাত দুটোয় তিনবার ডাহুক ডাকবে।'

বসন্তদার ডাহুকের ডাকে দুটো চড়াই কিচির-মিচির জুড়ে দেয়।

নিচ থেকে কে যেন বলে—'যতো সব পাগলের কাণ্ড।'

বসন্তদা কথাটা শুনতে পায় না। দুপুরেই বসন্তদার বাড়ি থেকে তপু বেরিয়ে যায়।

মনুমেণ্টের তলায় অন্ধকার। একঠোঙা বাদাম কিনে ভিড় এড়িয়ে

তপু বসল। আজ একবার মিলির সঙ্গে দেখা করবে। মিলির কথা ভাবলেই বুকটা কেমন চনমন করে। সেটা কষ্ট না খুশি বোঝে না। খানিকটা উত্তেজনা হয়। পার্থর কথাটা ওকে ভীষণ ভাবাচ্ছে। মুক্ত এলাকা নেই। কথাটার মানে কি। পার্থ আসে। অন্ধকারে তপুর ঘোড়াটা ওর পকেটে ঢুকিয়ে দেয়।

'কি হলো সকালে ?' জিজ্ঞেস করে।

তপু সকালের ঘটনা বলে।

স্টেটসম্যানের দিকে ওরা হাঁটে। আলাদা আলাদা। আগে পার্থ, পেছনে তপু। শনিবারের সন্ধ্যে। রাস্তায় ভিড়। হকারদের চেঁচামেচি। স্টেটসম্যানের সামনে একটা অন্ধকার জায়গায় মণ্টু দাঁড়িয়েছিল। পার্থকে দেখে এগিয়ে আসে। তপু ফোয়ারার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। মণ্টু আর পার্থ কথা বলছে। পাঞ্জাবির তলায় ঘোড়াটা নিয়ে তপু লোড করে। মালটা পকেটে ঢোকায়। একজন অচেনা লোক এখন কথা বলছে মণ্টুর সঙ্গে। একে তপু আগে দেখে নি। তপু ভাবে অনুমানটা ভুল হলে মুস্কিল। লজ্জায় পড়তে হবে। আজ হয়তো সত্যিকার লেনদেন হবে। আগেও হয়েছে। টাকা মার যাওয়ার ঘটনা বোধ হয় তারই প্রথম। তবু একটা চান্স নেওয়া। পার্থ এগোয় লোকটার সঙ্গে। মণ্টু দাঁড়িয়ে থাকে। তপু পেছন থেকে মণ্টুর কাঁধে হাত রাখে। ভয়ে মণ্টু লাফিয়ে ওঠে। পকেটে হাত ঢোকায়। তপু ফিসফিস করে—আমার সঙ্গে আয়।

মণ্টু অবাক হয়। তপুকে দেখে। তারপর তপুর সঙ্গে এগোয়। পার্থ আর সেই লোকটা ভিড়ের মধ্যে মিশে মেট্রোর দিকে হাঁটছে। দুজনে মেট্রো গলিতে ঢোকে। মণ্টু ব্যাপারটা বোঝে না। তপুর সঙ্গে থাকে; গলির মুখ থেকেই তপু দেখে ওরা সেই দিলরুবা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলো। গলির মোড়ে লোকের জটলা, ফুচকা নিয়ে কাড়াকাড়ি। লোকটা দিলরুবা থেকে বেরিয়ে গেল। তপুর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফায়। কপালে ঘাম জমে। পকেটের ঘোড়াটা

হাতের তাপে গরম হয়। চুলে ঢেউ তোলা ফর্সা লোকটা আসে। হোটেলে ঢোকার আগে চারপাশে এক নজরে দেখে নেয়। মিলেছে। তপুর বুকে আগুন নাচে। আয়, নিচু গলায় মণ্টুকে ডাকে।

দিলরুবার সামনে ওরা দুজন দাঁড়ায়। পর্দা টানা কেবিনটা দেখা যায়। সেই রকম ছায়ামাখা আলো। মসৃণ দেওয়ালে ফ্যানের হাওয়ায় গুরু গোবিন্দ আর হেমা মালিনী লুটোপুটি করে। গত দিনের মতো দোকানটা খালি।

কাউণ্টারের লোকটা ওদের দেখে। তপু বলে—'তুই কাউণ্টারের গুরু গোবিন্দকে সামলা।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মণ্টু পকেট থেকে একটা পাইপগান নিয়ে সর্দারজীর বুকে ঠেকায়। বলে—'কেমন আছেন।'

তপুর হাতে ঝকঝকে পিস্তল। এক ঝটকায় কেবিনের পর্দা সরায়। পার্থ তখন বৃটিশ মেক যন্ত্রটা দেখছিল। তপু হিস্ হিস্ করে—'কপাল ফুটো করে দেবো।' ফর্সা লোকটার চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। পার্থ মালটা পকেটে ঢোকায়। তপু এবার আরো এক পা এগোয়। লোকটার কপালে পিস্তলটা লাগায়। বলে—'চোখ বন্ধ করো।'

বাইরে মণ্টুর গলা—'তোমার দোকানের মুরগী বড়ো খাসা ওস্তাদ।'

তপুর কথায় লোকটা চোখ বোজে। তার পকেট হাতড়ে তপু আর একটা রিভলবার পায়। নিজের পকেটে ঢোকায়। হাতের যন্ত্রটার পেছন দিয়ে লোকটার মাথায় সজোরে মারে। একটা আলগা আওয়াজ করে লোকটা চেয়ারের ওপর পড়ে যায়। ওরা বেরিয়ে আসে। প্রায় দম বন্ধ করে অন্ধকার ময়দান ধরে ওরা ছোটে। মোহনবাগান মাঠের পেছনে আসে। তপুর শরীর দিয়ে আগুন ছুটছে। কিন্তু মাথাটা হাল্কা। একটা জয়ের স্বাদ পেয়েছে। ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে ও শোয়। পার্থ গোটা ব্যাপারটা মণ্টুকে

খোলসা করে। মণ্টু খুশি হয়। তপুর মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—'এই জন্যেই তো ওস্তাদ বলি।'

চারপাশ অন্ধকার। গাছের পাতায় হাওয়ার প্রেম, ভালোবাসা। কতো কথা, শব্দ। মাথার ওপর এক আকাশ তারা। দেখে চোখ যেন ভরে না।

তপু হঠাৎ পার্থকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর মা কেমন আছেন?' পার্থ অবাক হয়। তাকিয়ে থাকে। তপু বলে যায়—'অনেক দিন তুই বোধহয় মাকে দেখিস নি। তোর দেখতে ইচ্ছে করে না?' পার্থ সাড়া দেয় না। তপু যোগ করে—'কলেজে পড়ার সময় তোর মা রোজ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তোকে গঙ্গাজল আর তুলসী পাতা খাওয়াতো। ছেলে যাতে রাস্তায় মাঠে-ঘাটে বেঘোরে না মরে। তপুর গলার আওয়াজ পার্থর কানে কেমন ঠাণ্ডা কঠিন লাগে। ওর ভয় করে।

অন্ধকারে শক্ত কি একটা পার্থর কানের পাশে লাগে। তপুর ঘোড়ার নল। মণ্টু ভয় পায়। বলে, 'কি করছিস তপু?'

'আজ বিকেলে গিয়েছিলুম বরেনদার কাছে–' তপু জানায়—'জিজ্ঞেস করলুম, মুক্ত-অঞ্চল কোথায়? জেল ভাঙ্গার পর কমরেডদের কি হবে?' বরেনদা জবাব দিলো—'দলের মধ্যে কিছু শত্রুপক্ষের লোক ঢুকেছে। তারা প্রচার করছে মুক্ত-অঞ্চল, গণফৌজ সব বাজে কথা। এরা এজেন্ট, প্রোভোকেটার। পার্টি নির্দেশ দিয়েছে তাদের খতম করার।'

মণ্টু টুঁ শব্দ করে না।

তপু বলে—'এই পার্থ বলে বেড়াচ্ছে, মুক্ত-অঞ্চল নেই। এর কি হবে?'

পিস্তলের নলটা ও আরো জোরে পার্থর কানের পাশে চেপে ধরে। পার্থ অনড়, অসাড়। কথা নেই, প্রতিবাদ করে না।

'মাকে দেখতে ইচ্ছে করে?' তপু জানতে চায়। অন্ধকার জমাট

বেঁধে থাকে। তপুর কথা অন্ধকারে গিলে নেয়। জবাব আসে না।

'বরেনদা জিজ্ঞেস করলো—কারা বলছে এসব তপু?' আমি বললুম—'আপনার লেফটেনাণ্ট পার্থপ্রতিম।' বরেনদা হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো—কিছুক্ষণ। তারপর আমাকে বললো—'পার্থকে আর কথা বলার সুযোগ দিও না। তুমিই দায়িত্বটা নাও।'

তপু যেন বিকারের ঘোরে কথা বলছে। হাতের পিস্তলটা কিন্তু একই ভাবে পার্থর শরীরে সাঁটানো। 'আমার এখন ভীষণ রক্ত দেখতে ইচ্ছে করছে। মানুষের রক্ত। তাজা, গরম। পার্থ, তোর রক্ত কি গরম?'

পার্থ পাথর হয়ে গেছে। মণ্টু বোবা।

তপু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। পিস্তলটা পকেটে রাখে। বলে—'পার্থ, তোকে মারতে পারলুম না। তোকে মারার কথা ভাবলেই তোর মার মুখ মনে পড়ে। সেই গঙ্গাজল, তুলসীপাতা। আধভেজা চোখ। তুই এই শহর ছেড়ে চলে যা। তা না হলে মারা পড়বি। কেউ না কেউ তোকে মারবে।'

পার্থ উঠে দাঁড়ায়। ওর শক্ত লম্বা শরীর, যেন একটা পাথরের স্ট্যাচু। 'তুইও আমায় ভুল বুঝলি—' পার্থর গলা কান্নায় ভাঙা। এক দৌড়ে ও অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তপু আর মণ্টু বসে থাকে। কেউ কথা বলে না। রাত বাড়ে। শিশিরে ভিজে ওঠে ঘাস। দু একটা অন্ধকারে পোকা-মাকড়ের বুকে হাঁটার শব্দ ওঠে।

গোটা ব্যাপারটা তপু একবার ভাবার চেষ্টা করে।

'কোথায় চলেছি?' ও নিজেকে জিজ্ঞেস করে—'কোথায়, কোথায়?' রাস্তায় গাড়ি যায়। হেডলাইটের কড়া ঘন আলো শিশির ভেজা ঘাসে চলকে ওঠে। অসংখ্য কাঁচের টুকরো যেন ছড়িয়ে আছে।

আমাকে কয়েকটা ছায়া। চাপ-চাপ অন্ধকার। শিলিগুড়িতে সেই রাতটার কথা মনে পড়ে। সংগঠনের সম্মেলন ছিল। গায়ে জ্বর

নিয়ে তপু গাড়িতে উঠেছিলো। পার্থ বারণ করেছিলো যেতে। তপু রাজী হয় নি।

সকালবেলার শিলিগুড়ি। তখন মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। একটা হোটেলে ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এগারোটা পর্যন্ত হৈ চৈ। হাসি গান। আবছা চেতনার মধ্যে তপু সবটা শোনে না। বারোটা নাগাদ হোটেল খালি হলো।

নেতারা সব সম্মেলনে ব্যস্ত। প্রতিনিধিদেরও সময় নেই। ঘরের মধ্যে তপু দেখে পার্থ বসে আছে। একসময় ডাক্তার এলো। পার্থর সঙ্গে নিচু গলায় কথা হলো। তারপর আবার অন্ধকার। মাঝে দু'বার ওষুধ খেয়েছে। মাথায় ভিজে জলপটির ছোঁয়া। ওডিকোলনের হাল্‌কা গন্ধ। সন্ধ্যের দিকে সবাই ফিরলো। পার্থর সঙ্গে যেন কি কথা হলো। ঘরে কেউ ঢুকলো না। চিকেন পক্‌স্‌।

সারারাত ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুম। আবছা আলোয় মাথার কাছে পার্থর মুখ। ছুঁচোলো দাড়ি। পাতলা চুল। 'কষ্ট হচ্ছে?' নিচু গলায় পার্থ জিজ্ঞেস করে। পরদিনই কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা হলো। সেই সব দিন নেই হাওয়ায় ওডিকোলনের গন্ধ তবু লেগে থাকে।

সবকিছু যেন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। একভাবে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরের ধাপগুলো এতো গোলমাল হচ্ছে কেন? কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

নিজেকেও যেন তপু চিনতে পারছে না। কিবা আছে চেনার। বাবা, দাদাদের কথা কোনোদিন শোনে নি। ওরা বলেছে, এসব করে লাভ নেই। পস্তাতে হবে। ও হেসেছে। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। বুকের ভেতর একটা তেজী জেদ গোঁ-গোঁ করে। মাথা ঝাঁকায়। কিসৃসু পাই নি তোমাদের কাছে। এই সংসার, সমাজের কাছে। স্বাধীনতা চাই। মুক্তি চাই। আমি বুঝতে চাই, আমি বেঁচে আছি।

শরীরের মধ্যে আর্যরক্তের উচ্চাশা ফোঁসে। ওর মুখের ছাঁদ

মঙ্গোলয়েড। মনের মধ্যেও সেই দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠী দাপায়। তারপরেই আসে আর্যেতর হীনমন্যতা, দ্রাবিড়ীয় হতাশা।

মায়ের নরম, কোমল দিকটাও আছে। তাই পার্থকে মারতে হাত চলে না। ওর মায়ের মুখ মনে পড়ে। এটা কোথা থেকে এলো? আমার অনার্য বাবা, আর্য ঠাকুর্দা, অথবা মঙ্গোলয়েড মা, কে আমাকে ভিজিয়ে দেয়? তপু চুলের মধ্যে আঙুল চালায়। তির তির করে হাওয়া বইছে। হঠাৎ আকাশটা যেন অনেকটা নেমে এসেছে।

মন্টু নিচু গলায় বলে—'এবার ওঠা যাক।'

দুজনে অন্ধকার মাঠ ছেড়ে রাস্তায় আসে।

তপু বলে—'পরশু একবার কলকাতার বাইরে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'বারাসাত স্টেশনে সকাল দশটায় বিজুকে নিয়ে থাকবি। বারাসাত পর্যন্ত বাসে আসবি।'

মাঠের মধ্যে অন্ধকার ছিল। মানুষজন ছিল না। মনে হচ্ছিল গভীর রাত। পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। এসপ্ল্যানেডে এসে দেখা গেল সবে সন্ধ্যে। অনেক মানুষ। অনেক কথা। ফুর্তির ফোয়ারা।

মিলিদের বাড়িতে পৌঁছোতে ন'টা বাজলো। ডঃ বিশ্বাস তখন বাড়ি নেই। দোতলার মুখে কমলের মার সঙ্গে দেখা। তপুকে দেখে তার চোখ ভিজে ওঠে।

'কমল কেমন—'তপু জানতে চায়।

জবাব দিতে গিয়ে মাসিমা কেঁদে ফেলে। বলে—'একরকম। তোমার চা পাঠাচ্ছি।' মাসিমা ভেতরে চলে যায়।

এটা কমলের ঘর। তপুও থেকেছে এখানে। চেনা গন্ধ, চেনা বিছানা। মিলি ঢোকে। একরাশ চুল বুকের ওপর নিয়ে সে আঁচড়াচ্ছিল। চুল বাঁধবে।

তপুকে দেখে হাসে। জিজ্ঞেস করে—'টাকা চাই?'

তপু হাসে। বলে—'না। জেলের খবর বলো।'

মিলি গম্ভীর হয়—'দাদার সঙ্গে দেখা হলো। শরীরের অনেক জায়গায় চোট। খোঁড়াচ্ছে।'

তপু শোনে। এখন দুজনেই চুপ। বাইরে বড়ো ঘড়িতে একটা ঘণ্টা বাজলো। সাড়ে ন'টা।

'তুমি বলেছো তো যে জেল থেকে ওদের বার হওয়ার দেরি নেই!' তপু জানতে চায়।

'না। মিথ্যে আশা জাগিয়ে লাভ কি?'

তপু চটে ওঠে—'মিথ্যে আশা নয়।'

মিলি তপুকে এক পলক দেখে। বলে—'জেলের মধ্যেও মুক্ত-এলাকা, গণফৌজের খবর গেছে। দারুণ টেনশান। তার ওপর আমি এসব বললে হৈ চৈ বেঁধে যাবে।'

তপু সায় দেয়—'ঠিক বলেছো। আমি কালকে একটা চিঠি দেবো। পৌঁছে দিও।'

মিলি বলে—'শাদা পোশাকের অনেক পুলিশ থাকে। দেখে ফেলবে।'

'খোলা চিঠি নয়। তিনটে কবিতা।' তপু বলে।

মিলির হাতে ও একটা কাগজ দেয়। পর পর তিনটে কবিতা। অদ্ভুত নাম। পঞ্চমী, সাক্ষাৎকারের বেলা, দেখা হবে।

'এগুলো আবার কি কবিতা!' মিলি অবাক।

'ওরা বুঝবে। পঞ্চমীর দিন খালে জল থাকে না। ইণ্টারভ্যুর সময় আমরা এ্যাকশানে যাবো।' তপু হাসে।

'গেটের কারো সঙ্গে আলাপ হলো?' তপু জিজ্ঞেস করে।

'ওরে বাবা। লোকগুলোর চোখ-মুখ কি রাগী-রাগী। দেখলে ভয় করে! ওদের সঙ্গে কথা বলা যায় নাকি!'

তপু হতাশ হয় না। একটু ভাবে। বলে—'কিন্তু তোমাকে এটা করতে হবে মিলি।'

তপুর গলায় কিছু একটা ছিল। মিলি অচেনা চোখে তাকায়।

'আমায় ছেড়ে দাও তপুদা, আমি পারবো না।' সে জানায়।

'কেন?'

'আমার ভয় করে। লোকগুলো এমনভাবে তাকায়।'

'বড়োলোকের সুন্দরী মেয়েদের এটা বাতিক। সবসময়ে ভাবে, সকলে তাদের গিলতে আসছে।'

মিলির মুখ লাল। তপু সাবধান হয়। মিলির সামনে এসে দাঁড়ায়। তার কাঁধে দুটো হাত রাখে। মিলি কাঁপে।

'আমাকে একটু সাহায্য করো মিলি।' তপু বলে—'তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

মিলি চোখে ঝাপসা দেখে। 'এভাবে হয় না, এটা রাস্তা নয়।' সে বিড়বিড় করে—'আমি রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু আমার ভেতর থেকে কে যেন বলছে, তোমরা ভুল করছো।'

দু'হাতে নিজের মাথা ধরে তপু বসে পড়ে। মনে মনে ভাবে, চুপ করো মিলি। আর বোলো না। আমিও জানি। কিন্তু আমরা বড়ো একা। আমাদের পাশে কেউ নেই। কি করবো? পালিয়ে যেতে পারি না।

মাসিমা চা নিয়ে আসে। বলে—'তুমি খেয়ে যেও।'

হাতের চেটোয় রাখা চুলের গোছায় মিলি ক্লান্ত হাতে চিরুনি চালায়।

তপু ছকটা বিশদ করে। 'জেলের ভেতর একটা কারখানা আছে। মাঝে মাঝে মালপত্র নিয়ে গাড়ি টেম্পো সেখানে যায়। তখন জেলের মেন গেট খোলা হয়। মেন গেটটা খোলানো খুব দরকার। শনিবার বিকেল পাঁচটায় একটা টেম্পো কিছু মালপত্র নিয়ে গেটে আসবে।'

'কি থাকবে ওতে?'

তপু একটু ভাবে। বলে—'কিছু গ্রেনেড, বোম, দু-একটা ডিনা-মাইট স্টিক।'

মিলির মুখে রক্ত মুছে যায়।

'যা বলছিলুম—' তপু শুরু করে—'এমনিতে লরি, টেম্পো এলে ওরা মেন গেটটা খুলে দেয়। কখনো-সখনো চেক করে। ওইদিন যাতে চুপচাপ গেটটা খুলে দেয়, সেটা করতে হবে। তারপর সব আমাদের হাতে।'

কথা শেষ করে তপু তাকিয়ে থাকে মিলির দিকে। মিলির চোখে মুখে কষ্ট পাক খায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

তপু মিলির মাথায় হাত রাখে। 'আমায় বিশ্বাস করো। তোমার কোনো ক্ষতি আমি হতে দেবো না।'

মিলি চোখ বুজোয়। তপুর বুকে মুখ রাখে। সেই অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধটা তপুর নাকে ঢোকে। তপু বিড়বিড় করে—'মিলি। আমার মিলি। আমি আছি। ভয় পেও না।'

'কার টেম্পো? কে চালাবে?' মিলি ফিসফিস করে।

'একটা টেম্পো ম্যানেজ হয়েছে। আমি চালাবো।'

'তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?'

তপু হাসে। 'লাইসেন্স দরকার নেই।' সে জবাব দেয়।

'কাল আমি আর একবার জেলে যাবো।' মিলি জানায়—'দাদার জামা-কাপড় দিতে।'

'খুব ভালো।' তপু উৎসাহ দেখায়—'রোজ যাও। পারমিশন ম্যানেজ করো।'

ডাক্তার বিশ্বাস ফেরে। তপুকে দেখে সামান্য ঘাবড়ায়। বলে—'পুলিশের নজর আছে এ বাড়ির ওপর। খুব সাবধান।' তপুর হাঁটুট টিপে-টুপে দেখে। 'ও কে'—মন্তব্য করে।

মিলি সেই যে চুপ করেছে তারপর আর কথা বলে নি। খুব গম্ভীর চিন্তায় যেন ডুবে আছে।

রাতে খাওয়ার পর কমলের নামে তপু একটা চিঠি লেখে তিনটে কবিতা পাঠালুম। পড়িস। আমি আজকাল কবিতা লিখছি

সব ব্যাপারটা গুছিয়ে জানায়। চিঠিটা পড়ে নষ্ট করে ফেলতে বলে।

বেরোবার সময় মিলি এসে দাঁড়ায়। তপুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

তপু জিজ্ঞেস করে—'জুলিয়াস ফুচিকের নোটিস ফ্রম গ্যালোস পড়েছো?'

মিলি মাথা নেড়ে জানায়—হ্যাঁ।

'আর একবার পড়ো। পড়ার সময় ভেবো তপুদাই জুলিয়াস ফুচিক।'

একটা দলা-পাকানো কান্না মিলি গিলে নেওয়ার চেষ্টা করে।

সকাল থেকে আকাশে ঘন মেঘ। ঘিনঘিনে বৃষ্টি। জোর হাওয়া বইছিল। বেলা সাতটাতেও চারপাশ বিলকুল অন্ধকার। বসন্তদাকে নিয়ে তপু বেরোয়। বসন্তদা বেহালাটাও সঙ্গে নিয়েছে। তপু একটু ভালো জামা প্যাণ্ট পরেছে। যাকে কেতাদুরস্ত সাংবাদিক দেখায়। এ দুটো পার্থর। হাতে নিয়ে ও আনমনা হয়েছিল। বুকের মধ্যে কি একটা নড়াচড়া করছিল।

বাসে ওরা বারাসত পৌঁছোয়। তখন সাড়ে ন'টা। সেই একঘেয়ে বৃষ্টি আর হাওয়া পিছু ছাড়ে নি। প্ল্যাটফর্মে চটচটে কাদা। জামা-কাপড় ভিজে চুপসে গেছে।

মণ্টু আর বিজু আগেই পৌঁচেছে। সাড়ে ন'টা নাগাদ হাসানাবাদের গাড়ি ছাড়ে। ওরা দুজন করে আলাদা বসে, যেন কেউ কাউকে চেনে না।

বাইরে অসহায় ভিজে গাছপালা। মাটির গন্ধ আসে। দু পাশে টইটম্বুর খাল। ব্যাঙ ডাকে। তপুর বুকে বিষণ্ণতা গাঢ় হয়। বর্ষার দিনগুলোয় যেন কান্না-কান্না ভাব। অন্তত গোটা ছয়েক ঘোড়া দরকার। চারটে থাকবে বাইরের স্কোয়াডের হাতে। দুটো ভেতরে পাচার করতে হবে। আচমকা জোর ঘা দিতে হবে। অফেনস ইজ

স্থ বেস্ট ডিফেনস.। একবার ভড়কে দিতে পারলে আর ভাবনা নেই। যে যার মতো গর্তে ঢুকবে।

বসন্তদা মাঝে মাঝে বেহালার টুংটাং শব্দ করে। গাড়িতে লোকজন কম। রঙিন চশমা পরা বসন্তদাকে অনেকে অবাক চোখে দেখে।

তপুর কেন যেন বসন্তদাকে বড়ো অসহায় মনে হয়। হয়তো বসন্তদার শারীরিক অক্ষমতাকেই সে মমতা করে। রাস্তায় অন্ধ নাচারও তো এইভাবেই মানুষের মায়া কাড়ে। রাজনীতির বিশ্বাসে বসন্তদা সৎ, আন্তরিক। তবু বসন্তদার ওপর পুরো নির্ভর করা যায় না। লোকটার মধ্যে এক আজব খেপামি আছে। ফলে অনেক সময় নিজে বিপদে পড়ে এবং আরো পাঁচজনের বিপাক বাড়ায়।

বছর চারেক আগের সেই ঘটনাটা তপু আজো ভোলে নি। তখনও পার্টি হয় নি। ছেলেদের মধ্যে গাঁয়ে যাওয়ার জোয়ার উঠেছে। স্রেফ একটা লুঙ্গি, গামছা আর এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে যার যেদিকে চোখ যায় চলে যাচ্ছে। বোকা বনে ফিরেও আসছে কেউ কেউ। বসন্তদা গেলো হাওড়ায়, ওর মামার বাড়ির গাঁয়ে। মার্টিন লাইনের ছোট ট্রেনে চেপে ইছানগরী স্টেশন। সেখান থেকে বাসে আরো মাইল দশেক। গাঁয়ের নাম আঁধি।

তখন বর্ষাকাল। এক দুপুরে বসন্তদা কলকাতায় তপুব ঘরে হাজির। বাইরে তখন জোর বৃষ্টি হচ্ছে। রোগা শরীরে ভেজা পাঞ্জাবী। পাজামার তলায় কাদা মাখামাখি। কবেকার পুরোনো চটিজোড়া জলে ফুলে উঠেছে। আবছা অন্ধকার ঘরে রঙিন চশমা পরা বসন্তদা শীতে অথবা উত্তেজনায় কাঁপছে। ঘরের এক কোণে নগেনদা বসে বিড়ি টানছিল। বসন্তদা তাকে দেখতেই পেল না। ঝনঝনে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—'আর কতদিন শহরে বসে থাকবে? গাঁয়ে ঝড় উঠেছে! কৃষকেরা জেগেছে।'

বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে নগেনদা সোজা হয়ে বসে। কালই ও জলপাইগুড়ি থেকে সংগঠনের কাজে কলকাতায় এসেছে। তপুর ঘরেই রাত কাটিয়েছে কাল।

নগেনদার সঙ্গে বসন্তদার পরিচয় করালে বসন্তদা উৎসাহে আরো তেতে ওঠে। পঁয়ত্রিশ কেজি ওজনের পলকা শরীরটা নিয়ে ও নগেনদার পাশে তক্তাপোষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নগেনদাকে বলে—'কমরেড, একবার আমাদের এলাকায় চলুন।'

নগেনদা তাকায় তপুর দিকে। তপুকে কোনো কথার সুযোগ না দিয়েই বসন্তদা বলে—'তপুই নিয়ে যাবে আপনাকে।'

তপু তখন য়ুনিভার্সিটিতে সিলেবাস বদলের আন্দোলন নিয়ে বেজায় ব্যস্ত। তার সঙ্গে সারাদিন ঠাসা আরো রাজনৈতিক কাজ। কিন্তু ওর সব কথাই বসন্তদা প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল। তারপর নরম গলায় যোগ করলো—'শহুরে লড়াইয়ে জীবনটা ফুঁকে দিও না।'

তপু শেষ চেষ্টা করে—'আমার কাছে এখন একদম পয়সাকড়ি নেই।'

বসন্তদা দমে না। সহজ গলায় বলে—'জোগাড় করে নাও।' তপুর বই-এর আলমারির দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে—'কয়েকটা বই বেচে দাও। এতো বই কি হবে?'

বাইরে মেঘ ডাকে। বৃষ্টির কামাই নেই। নগেনদা একটু অবাক হয়েই হুস-হাস বিড়ি টেনে যায়।

বসন্তদাই আবার কথা বলে—'ফেরার ভাড়াটা আমি দিয়ে দেবো।'

বসন্তদার রোগা চেহারা, শুকনো মুখ, ময়লা জামাকাপড় দেখে তপুর কষ্ট হয়।

নগেনদা হঠাৎ দুম করে বলে—'দু'পিঠের ভাড়া না থাকলে কোথাও যাওয়ার বিপদ আছে।'

মিনিট দশেক পরে বৃষ্টির মধ্যেই বসন্তদা বেরিয়ে যায়। ঘরের মেঝেতে জল-কাদা হাওয়ায় শুকিয়ে ওঠে।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে দুপুর বারোটা নাগাদ নগেনদাকে নিয়ে তপু হাওড়া ময়দান থেকে ট্রেনে ওঠে। ফ্যাকাসে আকাশ, ঝিপঝিপে বৃষ্টি। তপু একপিঠেরই ভাড়া জোগাড় করতে পেরেছিল। কিন্তু নগেনদাকে সেটা জানায় নি। ট্রেনের টিকিট কেটে বাসভাড়া রেখে বাড়তি পয়সায় নগেনদার জন্যে ও এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই কিনল।

ঢিমে তালে ট্রেন চলছে। কামরায় পাঁচ সাত জন প্যাসেঞ্জার। হাওড়া থেকে ইছানগরী প্রায় ঘণ্টা চারেকের পথ। কিছুটা এগোতেই চেপে বৃষ্টি নামলো। বাইরের গাছপালা বৃষ্টিতে মিলিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে তোড়ে জল ঢুকছে। সব ক'টা জানলা বন্ধ হয় না। ট্রেনে ওঠার আগেই ওরা ভিজেছে। নগেনদার জামা গেঞ্জি বাঙ্কে শুকোচ্ছে। কোলে জড়ো করা ধুতি। খালি গা, নগেনদা কুঁকড়ে বসে আছে। কপালে বিড়ির আগুনের ছায়া। বৃষ্টিতেও দু'চারজন লোক ওঠানামা করছে। কামরার মধ্যে জল থৈ থৈ। বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দে কামরার মানুষগুলোর কথা মিশে যায়। চুপচাপ বসা নগেনদার মুখ দেখে তপু তার মনের তল খোঁজে। নগেনদাকে বোঝা ভার।

বৃষ্টিভেজা দেশ-পাড়াগাঁর মাঠ ফুঁড়ে ঘরবাড়ির চৌকাঠ ছুঁয়ে ট্রেন শেষ পর্যন্ত ইছানগরী পৌঁছোয়। বাইরে তখনও তুখোড় বৃষ্টি। ধোঁয়াটে মেঘে ঢেকে আছে চারপাশ। প্ল্যাটফর্ম বলতে মাটির তৈরি একটা লম্বা উঁচু ঢিবি। মাথায় কোনো ঢাকা নেই। তার মধ্যেই নামতে হলো দুজনকে। বসন্তদা বলেছিল, এই ট্রেনের কানেক্টিং একটা বাস্ আছে। সেটা ধরতে না পারলে এক ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। লাইনে ওই একটাই গাড়ি। শেষ মাথা ছুঁয়ে ওটা ফিরবে।

প্ল্যাটফর্মের লেজের দিকে কিছুটা ছুটেই তপু দেখে বাসটা চলে যাচ্ছে।

ঘোলাটে আকাশের তলায় সবুজ গাড়িটা মিশে গেল। নগেনদা মুখে একটা ফাঁকা আওয়াজ করে।

ঘণ্টাখানেক পরে বাস এলো। এবং তারও প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে আঁধির স্টপে যখন ওরা নামলো তখন মেঘ আর পাতলা অন্ধকার পৃথিবীর দখল নিচ্ছে। পীচের রাস্তার হু'পাশে টানা ধানক্ষেত একদৌড়ে আকাশ ছুঁয়েছে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। ধানক্ষেতে ব্যাঙ ডাকছে। কি একটা লাফিয়ে ওঠায় ক্ষেতের জল বেজে ওঠে। চারপাশে কোনো গাঁ বা মানুষের চিহ্ন নেই। অথচ বসন্তদার ওখানেই দাঁড়ানোর কথা। তপু বোকার মতো নগেনদার দিকে তাকায়। নগেনদা বিড়ির তলাটা দাঁতনের মতো চিবোচ্ছে। তপু লজ্জায় পড়ে। বসন্তদা যে তারই বন্ধু। তাছাড়া পকেটে বোধহয় আর পনেরোটা পয়সা পড়ে আছে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা চায়ের দোকানে বাসের জন্য বসে থাকার সময় কলকাতা ফেরার শেষ ট্রেনটা তপু চলে যেতে দেখেছে। ওর মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে। হু হু ঠাণ্ডা হাওয়াতেও কপালের মিনমিনে ঘাম শুকোয় না।

ডানদিকের ধানক্ষেত থেকে হঠাৎ হুজন বছর দশ বারোর ছেলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। তাদের হাতে বই, শ্লেট। স্কুল থেকে ফিরছে।

তপু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। জিজ্ঞেস করে—'আঁধি গ্রামটা কোথায়?'

একজন আঙুল দিয়ে বাঁ দিকের ধানজমির গায়ের আকাশটা দেখায়। অন্যজন বলে—'আমরা ওখানে থাকি।'

তপু খুশি হয়। তাকে জিজ্ঞেস করে—'বসন্তদাকে চেনো? বেহালা বাজায়? চোখে চশমা?'

তপুকে আর কিছু বলতে হলো না।

'আজ সকালে কলকাতায় গেছে। আমি দেখেছি।' একজন জানায়।

তপুর কেঁদে ফেলার অবস্থা।

অন্য ছেলেটা বলে—'না, শেষ পর্যন্ত যায় নি। দুপুরে ঘরে বাজনা শুনেছি।'

নগেনদার দিকে তপুর আর তাকাবার সাহস হয় না। এক পিঠের ভাড়া নিয়ে যে পৃথিবীর কোথাও পাড়ি জমান যায় না, এটা ও বুঝতে পারে। নগেনদা জ্ঞানী লোক।

দুটো বাচ্চা ছেলের পেছন পেছন ধানক্ষেত, জলাজমি পেরিয়ে ওরা আঁধি পৌঁছোয়। সেখানে তখন ভালোমতো আঁধার নেমেছে। কিছুটা দূরে একটা মাটির বাড়ি। একটা ঘরের খোলা জানলা দিয়ে আবছা হলুদ আলো বেরোচ্ছে।

জানলাটা দেখে একজন ছেলে বললো—'আছে।' বেহালার হাল্‌কা সুরটা তখনই তপু শুনতে পায়।

জুতো জোড়া হাতে সামনে তপু। ভাঁজ-করা প্যাণ্ট হাঁটুর ওপরে। পেছনে নগেনদা। ধুতি প্রায় কোমর বরাবর। খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তপু ডাকতেই ভেতরের বাজনা থেমে যায়। বসন্তদা জানলা দিয়ে তাকিয়েই চিনতে পারে। তারপর একদৌড়ে বাইরে এসে নগেনদার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। বলে—'কমরেড্‌, আমায় জুতো মারুন। বাজনার ঘোরে ভুলে গিয়েছিলুম।'

নগেনদার কপালের রেখাগুলো কুঁকড়ে ওঠে। এক পা পিছিয়ে বলে—'ওসব থাক। আগে এককাপ চা খাওয়ান।'

হারিকেন নিয়ে বসন্তদা ওদের আলো দেখায়। পুকুরঘাটে হাত মুখ ধুয়ে ওরা বসন্তদার ঘরে ঢোকে। মাটির ছোট ঘর। একটা সিঙ্গল্‌ তক্তাপোষে ময়লা বিছানা। মেঝেতে একটা চাটাই-এর ওপর বসন্তদার বেহালাটা শোয়ানো। ঘরে একটা ছোট টেবিলে গোটা চারেক বই। মাটির দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে মাও সে তুং-এর একটা বাঁধানো ছবি।

চা মুড়ি আসে। বসন্তদা বলে—'রাতের খাওয়া সেরে আমরা

মিটিং-এ বসবো। গাঁয়ের গরীব লোকেরাই চাঁদা তুলে ভোজ দিচ্ছে। চণ্ডীমণ্ডপে সভা হবে।

এতোক্ষণ পরে নগেনদা আবার সিধে হয়ে বসে একটা নতুন বিড়ি ধরায়।

বাইরে ঘন অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ আর ব্যাঙ ডাকে। গাছপালায় হাওয়ার শব্দ। গাঁয়ে কাজ করার এই নতুন অভিজ্ঞতা তপুর খারাপ লাগে না।

ঘণ্টাখানেক পরেই বসন্তদার সঙ্গে ওরা তুজন গাঁয়ের শেষ মাথায় এক গরীর কৃষকের ঘরে হাজির হয়। বসন্তদা বলে—'এটা হলো সদ্গোপ পাড়া।'

অন্ধকার রাস্তায় তপুর কয়েকবার পা পিছলেছে। মাটিতে আঙুল চেপে ও হাঁটছে। বসন্তদার হারিকেন রাত বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে মুষড়ে পড়ছে। বাড়ির মালিকের সঙ্গে বসন্তদা পরিচয় করায়। শাদামাটা নিরীহ লোকটার নাম কার্তিক হালদার। সে বসন্তদাকে খুব খাতির করলো। কার্তিকের বুড়ো বাবাও এলো ঘরের মধ্যে। তার পেছনে জনা চারেক কুচো ছেলেমেয়ে। সকলেই উদোম। ফ্যাকাশে চোখ মুখ, কাঠি-কাঠি হাত-পা। কার্তিক তাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। কার্তিকের বাপ বসন্তদার দাদামশায়ের গুণগান করতে থাকলো। তার জমি চষেই এই সংসার চার পুরুষ খাচ্ছে।

নগেনদা খুবই গম্ভীর। বার তুয়েক কৃষিবিপ্লবের কথা বলে এদের কাছ থেকে কোনো সাড়া মেলে নি।

একটু পরেই খাবার এলো। একটা হাঁড়িতে ভাত। হাঁড়ির মাথায় তিনটে থালা। তার সঙ্গে একটা শাদা মতো বাসনে মাংস। গরম মুর্গীর মাংস থেকে গল-গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ধোঁয়ার আড়ালে কার্তিকের বৌ-এর চোয়ালভাঙ্গা, কালচে মুখ।

ভাত, মাংস রেখে যাবার পরেই তপুর খেয়াল হলো একটা শাদা বেডপ্যানে মুর্গীর মাংস দেওয়া হয়েছে। ওর পাকস্থলীটা হঠাৎ গলার

কাছে লাফিয়ে ওঠে। মাঝখানে নগেনদাকে রেখে ওরা তিনজন খেতে বসেছে। বসন্তদা নিচু গলায় নগেনদাকে বলে—'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে মিলিটারি ছাউনি করেছিল। তারাই ওটা ফেলে গেছে। বাড়িতে অতিথি সজ্জন এলে ওরা এটা কাজে লাগায়। দেশ গাঁয়ে কেউ এসব দেখে নি। কিছু মনে করবেন না।'

কার্তিক হালদারের হয়ে বসন্তদা ক্ষমা চায়। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনভাবে বসন্তদা খাওয়া শুরু করে। তপুর হাত মুখের কাছে ওঠে না। সারা শরীর গুলোতে থাকে। নগেনদা দমবন্ধ করে খেয়ে চলেছে। দরজা, জানলার ওপারে আবছা অন্ধকারে কার্তিকের ছেলেমেয়েরা ঘুরছে। হয়তো মাংসের গন্ধ শুঁকেই ঘুমিয়ে পড়বে।

কার্তিক আর তার বাবা অতিথিদের খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুজনকেই এক থালা করে ভাত মাংসের ঝোল মেখে খেতে হয়।

চণ্ডীমণ্ডপের সভায় বসন্তদার সঙ্গে ওরা যখন পৌঁছলো রেডিওতে তখন রাতের খবর হচ্ছে। বৃষ্টির রাত। মণ্ডপের দাওয়ায় জনা পাঁচেক লোক। সকলেরই বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। সারাদিনের খাটুনিতে চোখের পাতা বুজে আসছে। বছর বিয়াল্লিশের একজন শক্ত সমর্থ চেহারার মানুষ হাজির হলো। জ্বলজ্বলে চোখ; একমুখ দাড়ি গোঁফ। বসন্তদার দিকে তাকিয়ে সে হাসে।

বসন্তদা সভা শুরু করার কথা তুলতে একজন বললো—'আগে খবরটা শেষ হোক।'

আর একজন বললো—'খবরের পর ভালো কেত্তন আছে।'

বসন্তদার কথায় কেত্তনটা সেদিনের মতো বন্ধ থাকে। সভা শুরু হয়। নগেনদা বলতে শুরু করে। বাইরে রাত বাড়ে। অন্ধকার ঘন হয়। হাওয়ার শব্দ, পোকামাকড়ের ডাক।

তুবড়োনো গাল, ভাঙ্গা চোয়াল এক কৃষক কিছুতেই জেগে থাকতে পারছে না। সে হঠাৎ নগেনদার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—'মশারি

টাঙ্গাতেই রাত কাবার হয়ে গেলো, ঘুমুবো কখন ?'

তার কথায় নগেনদার বক্তৃতা থমকে যায়। কথাটা তপুর বুকে বিঁধে থাকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু সেই দাড়িগোঁফওলা কমবয়েসী লোকটা জেগে আছে। এমনকি বসন্তদাও দু-পা থেবড়ে বসে ঢুলছে। অর্শের জন্যে বসন্তদা মাটি চেপে বসতে পারে না। সারাদিনের খাটা-খাটুনিতে সকলেই ক্লান্ত। সভায় এখন একজন শ্রোতাই জেগে আছে। তার দিকে তাকিয়েই নগেনদা ভারতীয় বিপ্লবের খুঁটিনাটি কলাকৌশল বলে যাচ্ছে। প্রায় মাঝ রাতে সভা শেষ হয়। একে একে সকলে বাড়ি ফেরে। দাড়িওলা লোকটা নগেনদার চোখে চোখ রেখে হাসে। তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

নগেনদাকে খুব হতাশ, ক্লান্ত দেখায়। বসন্তদাকে বলে—'এই দাড়িওলা লোকটাই কাজের। শেষ পর্যন্ত জেগে ছিল। একে রাজনীতি দিন।'

চোখের রঙিন চশমাটা কানের খাঁজে ঠিকমতো বসাতে বসাতে বসন্তদা বলে—'ওর নাম মানিক। মানিক বদ্ধ কালা।'

তপু আর নগেনদার দিকে তাকাতে পারে না।

কোনোমতে রাত কাটিয়ে পরদিন ওরা কলকাতায় ফিরেছিল। ভাড়া দিয়েছিল বসন্তদা।

অনেকদিন পরে বসন্তদার সঙ্গে তপু ট্রেনে চাপলো। কাঁকড়া মির্জানগর পেরিয়ে ট্রেন এখন চলছে বসিরহাটের দিকে। এগারোটার পর ট্রেন টাকি পৌঁছোয়।

দুটো রিক্সা নিয়ে ওরা বসন্তদার বাড়ি যায়। পুরোনো বিশাল বাড়ি। বসন্তদার দিকটা ফাঁকা পড়ে আছে। একজন চাকর থাকে। দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে ওরা আসে। ছাত থেকে ইছামতী নদী দেখা যায়। ওপারে খুলনা। বৃষ্টিভেজা আবছা সবুজ রেখা।

বাইরে তেমনি ধোঁয়াটে অন্ধকার। আজ আর সূর্য উঠবে না।

'রাত ছুটোয় ডাহুক ডাকবে। তিনবার।' বসন্তদা বলে।

ছুটো গ্রাম বাদ দিয়ে কাশীনাথ আদকের বাড়ি। বিকেল তিনটে নাগাদ তপু একা বেরোয়। রাস্তার হদিশ বসন্তদা দিয়েছিল। তবু ছু একজনকে জিজ্ঞেস করতে হয়। গ্রামের ভেতর দিয়ে মেঠো রাস্তা। কাদায় হড়হড়ে। বেতাল পায়ে তপু কোনোমতে কাশীনাথ আদকের বাড়ি পৌঁছোয়। ছু মাইল রাস্তা। বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওর বুকের মধ্যে ধুকপুক করে। বর্ষার বিকেল টুপ করে শেষ হয়ে সন্ধ্যা লেগেছে। রাস্তায় লোকজন কম। দোতলা পাকা বাড়ি। পাঁচিল ঘেরা। ডাইনে-বাঁয়ে পুকুর। পুকুর ধারে আশশ্যাওড়ার ঝোপ। ম্যালেরিয়া পাতার জঙ্গল।

'কাশীনাথবাবু আছেন'—তপু ডাকে। ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না। দরজায় কড়া নেই। লোহার শেকল। শেকল নাড়ায়। মিনিট খানেক বাদে একজন লোক দরজা খোলে। তপুকে দেখে।

'কাশীনাথবাবু কোথায়?' তপু জিজ্ঞেস করে।

'কত্তা পুজো করছেন।' লোকটা বলে—'আপনি একটু বসুন।'

লোকটার পেছনে তপু ভেতরে ঢোকে। মাটির উঠোন পেরিয়ে বসার ঘর।

তপুর জুতোয়, পায়ে কাদা। লোকটা এক বালতি জল, ঘটি দেয়। তপু জুতো ছেড়ে পা ধোয়। ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার। তপু তক্তাপোশে বসে। একটা টিকটিকি ডাকে। লোকটা একটা হারিকেন নিয়ে আসে।

ভেতর থেকে চটির শব্দ আসে। 'কেষ্ট কোথায় গেলি'—ভারি গলায় হাঁক ওঠে। লোকটা হারিকেন নামিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়। লোকটার নাম কেষ্ট। কেষ্টর হাত ধরে কাশীনাথ আদক ঘরে ঢোকে। 'সুবোধবাবু কেমন আছেন?' কাশীনাথ জিজ্ঞেস করে।

তপু ঢোক গেলে। কোনোমতে বলে—'ভালো।'

কাশীনাথ নিচু গলায় বলে—'আজকাল রাতে একটু কম দেখি। পাঁচজনে অবশ্য জানে না। যা হুজ্জুত চলেছে এদিকে।'

লোকটার বয়েস বছর ষাট। মজবুত শরীর। একটু মোটা আর কালো। কাশীনাথ তক্তাপোশে তপুর গা ঘেঁষে বসে। 'কেষ্ট, চা নিয়ে আয়—' হুকুম করে।

'দু-দিন থাকতে হবে কিন্তু—' কাশীনাথ বলে—'আগের বারে একঘণ্টা বসে চলে গিয়েছিলেন। কথা ছিল এবার দু দিন থাকার।'

তপুর শরীরে ঘামের ঝর্ণা নামে। গলা, মুখ, পিঠ ভেসে যায়। অজান্তে শক্ত ফাঁদে পড়ে গেছে। কোনমতে বলে—'দেখা যাক।'

কাশীনাথ আমল দেয় না। বলে—'অনেক খবর দেবো। কাগজ বোঝাই হয়ে যাবে। ভালো চার আছে। কাল মাছ ধরবো দুজনে। নাইলনের সুতো আনিয়েছি।'

তপুকে ঘিরে অন্ধকার, বৃষ্টি, ব্যাঙের ডাক পাগলা নাচন জুড়ে দেয়। গলা শুকিয়ে আসে।

কাশীনাথ বলে যায়—'একদিন আপনাকে নিয়ে শিকারে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। মোল্লাখালির গাঙে বেলেহাঁস নামছে। কিন্তু দিনকাল খারাপ। শুয়োরের বাচ্চারা ওৎ পেতে আছে। আমার পোষা মুরগি আমি গাছে ঝুলিয়ে হাত পাকাই। তাতে কোন শালার কি? কিন্তু শালারা বলে—কাশীনাথটা একটা কসাই। আসলে হিংসে। ছোটোলোকের ঝাড়। হিংসেতে জ্বলছে।'

কেষ্ট চা নিয়ে আসে। এককাপ। তপু চা খায়। ঘাম দ্বিগুণ হয়। কি কুক্ষণে সুবোধ সেনের নামে চিঠি লিখেছিল। এ লোকটা সুবোধকেও চেনে। এক ঘণ্টার জন্যে দেখেছে। তবু ভোর হলেই চিনতে পারবে। তপু পকেটে যন্ত্রটায় হাত বোলায়।

'জামাকাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করুন।' কাশীনাথ বলে। কেষ্টকে ডাকে। 'বাবুর ঘরটা দেখিয়ে দে।' হুকুম দেয়।

কেষ্টর সঙ্গে তপু দোতলায় আসে। দোতলার সিঁড়ির মুখে একটা

দরজা। রাতে এটা বন্ধ করে নাকি? তালা পড়ে? তাহলে নিচে নামার কি হবে! ছাদ থেকে লাফ মারতে হবে? তপুর মাথায় আবার সেই ফাঁকা নিঃসঙ্গতা নামে। এভাবে হয় না। এটা ভুল পথ। মিলির মুখ। হাতের চেটোয় এক গোছা ঘন কালো চুল। এই কেষ্টই তো দরজা খুলে দিতে পারতো। এটা তো কেষ্টদেরও লড়াই। নয় কি? বসন্তদা কেন কেষ্টর সঙ্গে কথা বললো না। কেষ্টকে বোঝালে সেও তো এই লড়াইয়ে নামতো। তাহলে কি কেষ্টর সঙ্গে এই যুদ্ধের কোনো যোগ নেই? এটা কি শুধু তার মতো দু চারজন শহুরে মানুষের পাগলামি? স্বপ্ন? কিন্তু তাই বা কেন? মুক্ত এলাকা তৈরি হয়েছে। গণফৌজ হয়েছে। কোনো এলাকার সব মানুষ এগিয়ে না এলে সেখানে ঘাঁটি হয় না। গণফৌজ গড়া যায় না।

ঘরের মধ্যে মেহগিনি কাঠের বনেদী আমলের খাট। পুরু গদি। তোষক পাতা বিছানা। তপু সটান শুয়ে পড়ে। হারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ছায়া নাচে। কিছু বাদে ও খোলা জানলার সামনে দাঁড়ায়। বাইরে কিছু দেখা যায় না। মহেঞ্জোদড়োর অন্ধকার। বৃষ্টির শব্দ ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়।

রাতে খাওয়ার সময় কাশীনাথ বলে—'এ অঞ্চলে আজকাল যা শুরু হয়েছে, বলার নয়।'

সন্ধ্যে থেকে তপু যতোটা সম্ভব কম কথায় কাজ সারছে। গলার আওয়াজ মানুষ ভোলে না। ও তাকায় কাশীনাথের দিকে। কাশীনাথ রাতে রুটি, দুধ আর সন্দেশ খায়। সঙ্গে পাকা মর্তমান কলা। একটা বিরাট জামবাটিতে সবগুলো মিলিয়ে লোকটা পকাৎ পকাৎ চটকাচ্ছে।

তপু জিজ্ঞেস করে—'কি হয়েছে?'

নিচু গলায় কাশীনাথ জানায়—'বন্দুক ছিনতাই শুরু হয়েছে।'

তপু সাড়া দেয় না।

'থানার বড়োবাবু বলেছে যার কাছে যা বন্দুক, রিভলবার আছে থানায় জমা দিতে।'

কাশীনাথ বলে যায়—'আজ দুপুরে থানায় দুটো জমা দিয়ে এলুম।'

তপুর মাথায় কে যেন ডাণ্ডা মারে। চোখের সামনে দেওয়াল, হারিকেন এক চক্কর ঘুরে যায়। মুখের ভাত ডেলা পাকিয়ে ওঠে। একটু লালা বেরোয় না।

কাশীনাথ জিজ্ঞেস করে—'খাচ্ছেন তো? ভালো কালবোস মাছ। খেয়ে নিন।'

খাওয়ার পর আরো দু পাঁচ মিনিট কাশীনাথ বকবক করে। তপুর কানে কিছু ঢোকে না। মুখে বমি-বমি ভাব। সব খাবার উগরে আসতে চায়।

তখন চারপাশ নিঝুম। থমথমে নীরবতায় চরাচর ডুবে আছে। তপু ঘরের দরজা খুলে রাখে। দোতলার মুখের দরজায় কেষ্টো হুড়কো লাগায়। চাবি দেয় না। তপুর ঘরে হারিকেন জ্বলে। অনেক দূরে একটা কুকুর ডাকে। ঘড়িতে তখন দশটা। তপু ঘরের দরজা বন্ধ করে। খোলা জানলায় চোখ রেখে বসে থাকে। শরীর নেতিয়ে আসে। চোখের পাতা ভারি; অথচ ঘুম নেই। মাথার মধ্যে টগবগ করে ঘিলু ফোটে। রগের দু পাশ কাঁপে। সময় আর কাটে না। জলে, পাতায় কোনো শব্দ হলে কান খাড়া করে। রাত গড়িয়ে যায়। বারোটা নাগাদ ঢুলুনি আসে। চোখ টান করে চেয়ে থাকে। হারিকেনের আলো কমে আসে। তপু ভাবে, ফিরে গেলে হয়। মাল জমা পড়ে গেছে। বেকার বসে লাভ কি! কিন্তু অন্ধকার রাস্তা চিনে যাওয়া মুশকিল। ভরসা হয় না। তার ওপর যদি ওরা ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়ে। একটা বাজলো। কাশীনাথ বোধহয় উঠলো। চটির শব্দ। বারান্দায় লোকটা ঘুরছে। বাড়ির বাইরে পায়ের চাপা আওয়াজ যেন। তপু জানলা দিয়ে তাকায়। কাশীনাথ

আবার ঘরে ঢোকে। দরজাটা ভেজায়। বাইরে শব্দ মিলিয়ে যায়। তপুর মাথার মধ্যে হাল্‌কা হাওয়া খেলে। হঠাৎ ডাহুক পাখির ডাক। কুর কুর কুর। তপু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছিটকে ওঠে। শব্দটা একবার হয়। ঘড়ি দেখে। রাত দুটো পাঁচ। কিন্তু তিনবার ডাকার কথা। ঠিক শুনেছে তো? কিংবা ঘুমের ঘোরে শোনা আওয়াজ এটা। তপু বুঝতে পারে না। বুকে হাপর চলে। ও আর দাঁড়ায় না। হারিকেন নিভে গেছে। অন্ধকারে কোনোমতে দোতলার দরজা খুলে নিচে নামে। সদরের মোটা হুড়কো সরাতে গিয়ে একটু আওয়াজ হয়। ও চমকে ওঠে। তারপর দরজা খুলে বাইরে আসে। প্যাচপেচে কাদা। চোখে কিছু দেখা যায় না। কোনদিকে সাড়াশব্দ নেই। কেউ নেই। একটা কুকুরও ডাকছে না। ওরা এলো না কেন? তপুর বুকের রক্তে ঢেউ খেলে। পুলিশ কি ওদের তুলে নিল? আর ভাবতে পারে না। অন্ধকারে কাদা, বনজঙ্গল মাড়িয়ে ও হাঁটে। নিশিতে পাওয়া বেসামাল মানুষ যেন। এক সময়ে ও খুঁজে পায় বসন্তদার বাড়ি। দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতে খুলে যায়। অনেক দূর থেকে শব্দটা ও শুনছিল। কাছে এলে সেটা স্পষ্ট হয়। ঘরের দরজায় মুখ রেখে ও দেখে বসন্তদা বেহালা বাজাচ্ছে। মেঝেতে চাটাই-এর ওপর মণ্টু আর বিজু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তপুর মাথায় আগুনের ছররা ঢুকে যায়। বসন্তদার হাত থেকে একটানে বেহালাটা কেড়ে ও মেঝেতে আছাড় মারে। শান-বাঁধানো মেঝে। বিকট আওয়াজে বাজনাটা কয়েক টুকরো হয়ে যায়। বিজু আর মণ্টু ধড়ফড় করে জেগে ওঠে। রঙিন চশমা চোখে বসন্তদা মুখ নিচু করে বসে থাকে।

মণ্টু দেখে, তপুর ঘড়িতে চারটে বাজে। কেউ কোন কথা বলে না।

বিজু বলে—'বসন্তদার আমাদের জাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা।'

ওর কথাটা কেমন কান্নার মতো শোনায়।

বসন্তদা হঠাৎ ফিসফিস করে—'তুমি আমায় বাঁচালে তপু। বুর্জোয়া ভাইস।'

কাশীনাথ আদকের মাল দুটোর ওপর তপু খুব নির্ভর করেছিল। হাতছাড়া হতে দমে গেছে।

বসন্তদা সারা রাস্তা একটুও কথা বলে নি। মণ্টু আর বিজুও বসেছিল মুখ ভার করে। কলকাতায় তপু ওঠে অরিন্দমের বাড়িতে। অরিন্দম য়্যুনিভার্সিটির বন্ধু। ভালো ছেলে, বড়ো চাকরি করে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। রাজনীতি নিয়ে মাথাব্যথা নেই। বিলিতি ব্লেডে দাড়ি কামায়। তপুকে ভালোবাসে।

'কি চেহারা হয়েছে তোর।' তপুকে দেখে ও বলে—'একেবারে ভ্যাগাবণ্ড টাইপ।'

অরিন্দমের ব্লেডে তপু দাড়ি কামায়। শ্যাম্পু করে। অরিন্দমের ঝলমলে জামা প্যাণ্ট ওর লেগে যায়। অরিন্দমের বাড়িতে ওর বিধবা মা। একমাত্র দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। অরিন্দমের পাত্রী খোঁজা হচ্ছে।

দিন এগিয়ে আসছে। তপুর ছটফটানি বাড়ে। এ বাড়িতে আসার ওর দুটো কারণ আছে। দলের যোগাযোগের সব ডেরাগুলো পুলিশ জেনে যাচ্ছে। হাওয়ায় খবর রটছে। পার্টি শেলটারে একবারের বেশি থাকতে তাই বুক কাঁপে। সবাই খুঁজছে আত্মীয়স্বজন, সাধারণ বন্ধুর বাড়ি। সেখানে বিপদ কম। অনেকটা এই কারণেই তপু এসেছে অরিন্দমের কাছে। এক বিছানায় শুয়ে দুজনের অনেক রাত কেটেছে। আরো একটা ব্যাপার আছে। এটা তপুর একান্তই ব্যক্তিগত। কিছুদিন ধরে ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে। সঙ্গে মাথাধরা, ক্লান্তি। গ্রাহ্য করে নি। মাঝে একদিন রক্ত বেরোলো গলা দিয়ে। অনেকটা পুরোনো কালো রক্ত। তপু একটু মুষড়ে পড়েছে। এখন ওর অনেক কাজ। চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকার সময় নেই। ওষুধ ডাক্তারের

জন্যে পয়সারও অভাব। ডাক্তার বিশ্বাস আছে। কিন্তু সে ভদ্রলোক নিজের ঘায়ে পাগল। খুব দুর্বল, ক্লান্ত মাথায় তপুর মায়ের মুখ মনে পড়ে। মা সেই মহিলা, যেন অনেক কাল আগের ফিকে স্মৃতি। পৃথিবীর কোথাও এখনো মা আছে, গেলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে—একথা ভাবলেই দু-চোখ বুজে আসে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। অরিন্দমের বাড়িতে সে অন্তত দু-বেলা ভালো খাবে। চাকরির সুবাদে অরিন্দম দরকারী ওষুধগুলোও এনে দেবে। রোগে ভুগে বেঘোরে সে মরতে রাজি নয়। অনেক কাজ। শরীরটাকে চাঙ্গা রাখতেই হবে।

মণ্টু, বিজুকে নিয়ে বিকেলে তপু গেল বরেনদার কাছে। বরেনদা এখন সকাল বিকেল আস্তানা বদলাচ্ছে। শরীর খুব কাহিল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। তপুর কেমন মায়া হয়।

শনিবারের অ্যাকসান নিয়ে বরেনদার সঙ্গে আলাপ হলো।

'বেলগাছিয়ার মনু আর সাজাদকে টিমে নাও।' বরেনদা বলল।

মনুর নাম শুনে বিজু চমকায়। বলে—'মনু নয়।'

'কেন ওয়াগন ব্রেকার?' বরেনদার চোখ দুটো যেন আতস কাঁচ। জ্বলতে থাকে।

বিজু একটু চুপ করে থেকে বলে—'ও পুলিশের লোক।'

'ঠিক আছে। তোমাদের অ্যাকশান। তোমরা ঠিক করো।' বরেনদার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে। গলার কাছে যেন কফ জমেছে। ঘড়ঘড় শব্দ।

'আর দুটো ঘোড়া দরকার'—তপু বলে—'জেলে পাঠাতে হবে।'

'কাল পাবে।'

'গাড়ি লাগবে কয়েকটা।'

'চারটে অ্যাম্বাসাডার বলা আছে, ওই দিন জেল গেটের আশে-পাশে আর খালের ওপারে থাকবে। নম্বর নিয়ে যেও।'

'কোথায় উঠবে ওরা?'

'ড্রাইভারদের বলা থাকবে।'

তপু আর কথা বাড়ায় না। বরেনদার কপাল কুঁচকে যায়। যন্ত্রণা হচ্ছে। তপু দাঁড়ায়। বরেনদা এক পলক তাকায়। বলে—'তোমার অসুখটা কি? শরীরের এ রকম হাল হচ্ছে কেন?'

তপুর মাথাটা ঘুরে যায়। আজও রক্ত পড়েছে। কোনো জবাব না দিয়েই ও বেরিয়ে আসে। সঙ্গে বিজু মণ্টু।

দিনের শেষ আলো তখনো আকাশের গলা জড়িয়ে আছে। যেতে মন চায় না।

মণ্টু বলে—'আমরা ফিরি? ফিউজগুলো ডেলিভারী নেবো।' ওরা চলে যায়।

তপু ফোন করে মিলিকে। মাসিমা ফোন ধরে। মিলি বাড়ি নেই। কমলের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। রোজ যায়। তপু খুশি হয়। নিজের মনে বলে—'সাবাস।'

কিন্তু মাথাটা ঘুরতেই থাকে। ও ঠিক করেছে, আজ রাতে অরিন্দমের কাছে কিছু ওষুধ চাইবে। বছরখানেক আগে মানিকদার মারা যাওয়ার ঘটনাটা মনে পড়ে। মানিকদা ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা। কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। নাওয়া খাওয়ার জায়গা ছিল না। স্ট্রোক হয়। রাস্তায় পড়ে ছিল অজ্ঞান শরীরটা। দলের একজন কিছুদিন সেবাযত্ন করে। তারপর মানিকদা এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে যায়। ছেলেবেলার বন্ধু। রাজনীতির ধার ধারে না। মানিকদাকে দেখে ভদ্রলোক অবাক। সেই ডাক্তার বন্ধু অনেক চেষ্টা করেও মানিকদাকে বাঁচাতে পারে নি। পুলিশ মর্গে গিয়েছিল মানিকদার মৃতদেহটা। মানিকদার আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে তপুও মর্গে গিয়েছিল। একটা অন্ধকার ঘর। পচা মাংসের বিষগন্ধে ভারি। মানিকদার উদোম শরীরটা মেঝেয় পড়েছিল। চেরা পেট। গুণ ছুঁচে সেলাই করা। কনুই, হাঁটু চেরা। সেলাই হয় নি।

আবছা অন্ধকার ঘরে সেই ভয়াবহ মূর্তিটা দেখে তপু কেঁপেছিল। মানিকদার পুরুষাঙ্গটা যেন মরা তালপাকানো চামচিকে। দু উরুর সন্ধিতে আটকে ছিল। তখনও তপু ছাত্র। পুলিশ তাড়া করে নি। নিজের শরীরের কালচে রক্ত দেখে তপুর ভয় হয়েছে। অবশ্য মানিকদার বয়েস হয়েছিল। ষাট ছুঁই-ছুঁই।

এ তল্লাটে অনেক গাছ আছে। এক ঝাঁক টিয়া খুশির চিৎকার তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

একবার রমার বাড়ি যাওয়া দরকার। একটা পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসে তপু ওঠে।

রমা তার নামে বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছে। কথাটা তপুর মনে ছিল। রাগও ছিল। রমাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। রমার জন্যে একটা কাজও আছে। রমা পারবে। তপু বাস ধরে।

বছর দুই আগের কয়েকটা ঘটনা ওর মনে পড়ে। এক বিকেলে চারটে নাগাদ চৌরঙ্গী পাড়ায় এক সিনেমা হলের সামনে ও দাঁড়িয়েছিল। বিজুর জন্য অপেক্ষা করছিল। তখনও চারপাশ এত তেতে ওঠে নি। ওদের নামে ওয়ারেন্ট ছিল না। কিছু আগে শো শুরু হয়েছে। একটা মোটা দাগের ইংরেজি ছবি। হলের সামনেটায় খুব ভিড় ছিল এতোক্ষণ। এখন খালি। ফাঁকা জায়গায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে তপুর অস্বস্তি হয়। মনে হয় সকলে দেখেছে। উল্টোদিকের ফুটে ও চলে আসে। বই-এর স্টল। বই দেখে। হঠাৎ নজরে পড়ে, হল থেকে বেরোচ্ছে প্রণব আর রমা। তপু এক পা এগোয়। ডাকতে গিয়েও কি ভেবে থেমে যায়, ওদের খুব ব্যস্ত দেখায়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা চলে যায়। তপু হাসে, ছবিটা নিশ্চয়ই ওদের ভালো লাগছিল না। কিছু বাদে বিজু আসে। ঘটনাটা সামান্য। বিজুকে বলতেও ভুলে যায়। পরদিন সকালে কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল—সিনেমা হলে বিস্ফোরণ। শো বন্ধ। ব্যাপারটা তপু বোঝে নি। রমা আর প্রণব চোট খাওয়ার

হাত থেকে জোর বেঁচেছে, এ কথাই ওর মনে হয়েছিল।

এই ঘটনার মাস দুয়েক বাদে আর একটা ব্যাপার হলো। চৌরঙ্গীতে একটা লাইব্রেরীতে তপু ঢুকেছিল। বিদেশী পত্র-পত্রিকা ওল্টাতে। হঠাৎ দেখে কিছু দূরে রমা। দুজনে চোখাচোখি হয়। রমা চোখ ঘোরায়। তপু ভাবে, রমা বোধহয় দেখে নি। ঠাণ্ডা ঘর। অদ্ভুত চুপচাপ। মন দিয়ে বই পড়ছে সকলে। তপু আর রমাকে ডাকে নি, আরো মিনিট দশেক 'পরে ও বেরোয়। দরজার কাছে এসে রমার দিকে নজর করে। রমা নেই। মেয়েটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেল। কোথায় গেল, তপু ভেবে পায় না। ও এলিটের দিকে হাঁটে। কর্পোরেশনের বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই একটা জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ ওর কানে আসে। মাটি কেঁপে ওঠে। মানুষজন থমকে যায়। ও দেখে, পেছনে লাইব্রেরীর দরজা দিয়ে পড়ুয়ারা পড়ি-মরি ছুটে বেরোচ্ছে। তাদের ঘিরে ধরেছে চাপ-চাপ কালো ধোঁয়া। পুলিশের বাঁশি বাজছে। তপু জোরে পা চালায়। বুকের মধ্যে হঠাৎ কি এক সন্দেহ দুলে ওঠে। সেই ঘটনা নিয়ে হৈচৈ হয়েছিল। কেউ ধরা পড়ে নি। কিন্তু তপু জানে। এই লাইনেই কাজ আদায় করতে হবে।

দোতলায় প্রণবদের ফ্ল্যাটের সিঁড়ির মুখটা তেমনি অন্ধকার। নতুন আলো লাগে নি। ভীষণ গুমোট। চারপাশ চুপচাপ। তপু দরজার কড়া নাড়ে। ভেতরে শব্দ ওঠে। একেবারেই দরজা খুলে যায়। তপুর কামানো মুখ, চকচকে জামাকাপড় দেখে রমা ঘাবড়ে যায়। ওর মুখ কালো হয়। তপু নিজেই ভেতরে ঢোকে। দরজা বন্ধ করে। ওর মনে হয়, রমা যেন কাঁপছে। ভেতরে আলো জ্বলছিল। তপু দেখে, একদিনে রমার চোখ-মুখ বসে গেছে। মাথার চুল বেওয়ারিশ, রুক্ষু।

'এক কাপ চা খাওয়াও।' তপু সহজ গলায় বলে।

রমা একটু সাহস পায়। রান্নাঘরে ঢোকে। স্টোভ জ্বালায়।

দরজার চৌকাটে তপু দাঁড়িয়ে থাকে। রমা তাকাচ্ছে না।

'ভয় পাচ্ছো?' তপু জিজ্ঞেস করে।

রমা এবার তাকায়। ওর চোখে ভয়।

তপু বলে—'প্রণবের লাইন আমি মানি না। তা বলে ওকে পুলিশেও ধরাবো না।'

রমা সাড়া দেয় না। কেটলির জলে সোঁ-সোঁ শব্দ হয়।

তপু তাকিয়ে থাকে। তারপর নিজের মনে বিড় বিড় করে—'আজ যদি গুলি খেয়ে রাস্তায় আমি মরে থাকি, তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে?'

রমা ফ্যালফ্যাল চোখে দেখে। কেটলিতে জল টগবগ করে। 'প্রণব একথা বলবে না—' তপু ফিসফিস করে।

হঠাৎ রমা কেঁদে ফেলে। বলে—'ভুল করেছি তপু। লালবাজার লকআপে দেখা করতে গিয়েছিলুম ওর সঙ্গে। ও বলেছে, কে করেছে এ কাজ।' ওরা দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কেটলির জল ফুটে ফুটে মরে যায়।

'তপু বলে—'চা বানাও। জল যে শুকিয়ে গেল।'

প্রণবের বাড়ি থেকে ফেরার সময় তপু জিজ্ঞেস করে—'ওকে জেলে নিচ্ছে কবে?'

'কাল।'

'কোন জেলে?'

রমা নাম বলে। তপুর চোখে আলো খেলে। বলে—'তুমি জেলে যাচ্ছো নাকি কাল?'

'হ্যাঁ।'

রমার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে তপু ফিসফিস করে। রমার ঘাড়ে ওর নিশ্বাস লাগে। 'শনিবার বিকেল পাঁচটা'—তপু মনে করায়।

চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে তপু ঘুরে দাঁড়ায়। 'একটা কাজ করবে?' তপু জিজ্ঞেস করে।

রমা তাকায়। তপু নিচু গলায় কথা বলে। রমা ভয় পায়।

'কিচ্ছু নয়—এক বাণ্ডিল জামা-কাপড়ের সঙ্গে ঢুকিয়ে দিলে কেউ বুঝবে না।'

রমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তপু নিজের পকেটের যন্ত্রটা একটা ব্রাউন কাগজে প্যাক করে। 'ভালো করে রাখো।' রমার হাতে গুঁজে দেয়।

'আমার ভয় করছে।' রমা বলে।

তপু ওকে দেখে। 'তোমার তো ভয় করার কথা নয়—নিজের হাতে দু দুটো এ্যাকশন তোমায় করতে দেখেছি।' তপুর গলা হিস হিস করে।

রমার মুখ ফ্যাকাশে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তপু তখন চলে গেছে।

রাস্তার চারপাশ দেখে সাড়ে আটটা নাগাদ তপু ঢুকলো মিলিদের বাড়িতে। মিলি চান করছিল। মাসিমার সঙ্গে দু-একটা মামুলি কথা হলো। নিচে ডাক্তার রুগী দেখছে।

মিলি এলো। তপুকে দেখলো অনেকক্ষণ। 'ভোল বদলেছি।' তপু হাসলো।

মিলির চুল ভিজে। জল চিকচিক করছে। মুখে কোনো রেখা নেই।

'কি খবর?' জিজ্ঞেস করলো তপু।

'কি জানতে চাও।' মিলি যেন অনেকদূর থেকে কথা বলে।

'কতদূর এগোলো?'

মিলি দাঁতে ঠোঁট কামড়ালো। তারপর কিচ্ছু না বলেই চলে গেল ঘর থেকে। অনেক ভাঁজ করা একটা ছোট চিঠি দিলো তপুর হাতে। কমলের চিঠি। 'তিনটে কবিতাই ভালো হয়েছে। বেশ বোঝা যায়। শনিবারের জন্যে ওরা হাঁ করে বসে আছে। সব তৈরি। গোটা দুয়েক ঘোড়া দরকার।'

একদমে তপু চিঠিটা পড়লো। 'দারুণ।' বললো।

মিলি একইভাবে তাকিয়ে আছে।

'আজ দিল?' তপু জানতে চায়।'

'পাঠিয়ে দিয়েছে। তারকবাবুর হাতে।'

'তারকবাবু কে?'

'জেলের ওয়ার্ডার। চাবি আগলায়।'

উত্তেজনায় তপুর বুক ফেটে পড়ার অবস্থা। 'বাড়িতে দিয়ে গেল?' হিস-হিস করে ও।

'হ্যাঁ।'

'আলাপ হলো কি করে?' একগাদা প্রশ্ন তপুর মুখ থেকে গল-গল করে বেরিয়ে আসে।

'জানতে চেয়ো না।' মিলির ভিজে মুখ শুকিয়ে ওঠে—'লোকটা পাগল।'

মিলির গলায় তপু কিসের যেন গন্ধ পায়। ওর বুকে একটা লোহার বল আটকে থাকে।

মিলি অন্যমনস্ক। বাইরে ঘড়িটা শব্দ করে—ঠিকঠাক। ঠিকঠাক।

মিলি বলে—'লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গেলুম। দাবড়ে উঠলো। আমার সঙ্গে কি দরকার? পালিয়ে এলুম। পরদিন ওষুধ দিতে গেলুম। খুব ভালো ব্যবহার করলো। জেলের ভেতর কোয়ার্টার। সেখানে থাকে। জিজ্ঞেস করলুম, কে আছে বাড়িতে? বললে, কেউ নেই। মা নেই। ভাই বোন, আত্মীয়বন্ধু কেউ নয়। শুধু এই তালা আর চাবির গোছা। ডিউটি অফিসার হাসছিল। বললো, ওটা একটা উন্মাদ। লোকটা তাকালো না। জিজ্ঞেস করলুম, বিয়ে করেছেন? আমার মুখের দিকে কিরকমভাবে যেন তাকালো। জবাব দিল, আপনি আমায় বিয়ে করবেন? গলার স্বরে কি যেন ছিল। আমি কেঁপে উঠলুম। হাসতে গেলুম, পারলুম না। সেদিন জানলুম, ওর নাম তারক। জেলের মধ্যে ও দাদাকে খুঁজে

বার করেছে। রোজ বাড়িতে এসে সব খবর দিয়ে যায়।'

তপুর মনে হয় সে যেন কি হারাতে বসেছে। চারপাশে ধস নামছে। বলে, 'লোকটা ভাঁড়ামো করছে না তো?'

মিলির শরীরটা একটু শক্ত হয়। সে বলে—'তোমরা ছাড়াও পৃথিবীতে কিছু ভালো লোক আছে।' তপুর বুকের সেই কালো রক্ত ঘন হয়, জ্বলতে থাকে। ছিনতাই করা রিভলবারটা পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর রাখে।

বলে—'তারকবাবুকে দিয়ে এটা কমলের কাছে কাল পাঠিয়ে দাও।'

মিলির খোঁপা বাঁধা ভিজে চুল খুলে গেছে। ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে, কাঁধে। কেমন যেন ভয়-ধরানো চেহারা। মিলি কি প্রলয়ের নাচ জুড়বে।

'পারবো না।' মিলি বলে—'একটা ছাপোষা লোকের ভাত-মারা উচিত নয়।'

'কেউ জানবে না। এটা করতেই হবে।'

মিলি তাকায়। তপুর চোখে কুচো আগুন। 'তা না হলে তারক মরবে। কথা না শুনলে আমি ওকে বাধ্য করবো।'

টেলিফোন বাজে। মিলি উঠে যায়।

'কে? বড়োমাসি? হ্যাঁ, দেখা হচ্ছে। মেসোমশাই ব্যবস্থা না করলে হতো না। ব্যবহার ভালো। হ্যাঁ। ঠিক আছে। না, না। মুচলেকা দেবে না। দাদাটা গোঁয়ার। ঠিক আছে। রাখছি।'

তপু একটা বাদামী বড়ো লেফাফায় ঘোড়াটা মুড়ে দেয়। লোড করাই আছে। দানার অভাব। কাল কিছু পাওয়ার কথা। দেখা যাক। কাজ ভালোই এগোচ্ছে। কিন্তু এই তারক লোকটা মিলির বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। পাগল-ছাগলদের মেয়েরা সব সময়েই একটু বেশি স্নেহ করে।

মিলি মোড়কটা দেখে।

'এটা তাহলে পৌঁছে দিও।' তপু বলে।

'কাল আমি যাবো না।'

'তারক আসবে?'

'জানি না।'

তপু জানলার কাছে আসে। নিচে তাকায়। ওর চোখ সরে না। বলে—'পুলিশ।'

মিলি চমকে ওঠে। হাত ধরে তপুকে টেনে নেয়। বাইরে দরজার মুখে দুটো কালো ভ্যান। সার দিয়ে পুলিশ নামছে। মিলি অদ্ভুত কাণ্ড করে।

বাদামী কাগজের মোড়কটা কোমরে গুঁজে শাড়ি ঢাকা দেয়। তপুর হাত ধরে।

'ছাতে চলো।' ফিসফিস করে।

অন্ধকার ছাত। নিচে ডাক্তারের সঙ্গে পুলিশের কথার শব্দ কানে আসে। মিলি পাশের বাড়ির দিকে আঙুল দেখায়। 'ওই ছাত থেকে একটা লোহার সিঁড়ি আছে—পেছনের রাস্তায়ও নেমেছে। তাড়াতাড়ি।'

মিলি হাঁপাচ্ছে। তপু অন্ধকারে মিলির মুখটা দু হাতে ধরে। ঠোঁটে ঠোঁট লাগায়। তারপর এক লাফে পাশের বাড়ির ছাতে নেমে যায়। ওর বুকে সেই মিষ্টি গন্ধটা ফিরে আসে।

একটা দিন ঝড়ের মতো কাটে। বরেনদা দুটো ঘোড়া দেয়। দানাও আসে অনেক। চারটে গাড়ির মধ্যে দুটোর নম্বর হাতে আসে। বাকি দুটো পরে জানা যাবে। মাল-মশলা রেডি।

একদিন পরে সন্ধ্যেবেলায় তপু ফোন করে মিলিকে। অরিন্দম বাড়ি ফেরে নি। তপু ভাবে, খোস মেজাজে গল্প করবে আজ। মাসিমা ফোন ধরে। বলে—'তারক এসেছিল।'

তপু শোনে। 'মিলিকে দিন।' ও জানায়।

‘মিলির কি যেন হয়েছে। ও শুয়ে আছে।’

‘একটু দরকার আছে।’

মিলি আসে।

‘আমি তপু।’

ওপাশ থেকে কোন সাড়া নেই।

‘ওটা দিয়েছো?’

‘হ্যাঁ।’

‘টেম্পো দেখে ও গেট খুলবে তো?’

‘হ্যাঁ।’

মিলির গলায় কোন তাপ নেই। জীবন নেই। তপু অবাক হয়।

‘মিলি, তোমার কি হয়েছে?’

সাড়া নেই।

‘শরীর খারাপ?’ তপুর বুকের মধ্যে সেই কষ্টটা গুর-গুর করে। ও চেঁচায়—‘মিলি কথা বলো। প্লীজ, চুপ করে থেকো না।’

টেলিফোনের ওপাশে কে যেন গোঙাতে থাকে। কান্না চাপার ভীষণ কষ্টে রিসিভার যেন গলে যায়।

‘মিলি! আমার মিলি!’ তপু চেঁচায়।

‘আমি মরে গেছি তপু।’ টেলিফোনটা শব্দ তুলে কেটে যায়।

দিনটা শুরু হয়েছে মেঘ আর বৃষ্টি দিয়ে। সকালবেলায় এক পশলা জোর বৃষ্টি হলো। তারপর রোদ উঠলো। বেশ কিছু বাদে আবার মেঘ, নেই-আকড়া টিপটিপ বৃষ্টি।

বিজু বললো—‘জ্বালালে।’

মন্টু দুটো ডাব নিয়ে ঢুকল। বিজুকে দিল। বাঁ হাতে একটা ধরে ডান হাতের পাতা দিয়ে বিজু ডাবের মুখে মারল। মুখটা ছেড়ে গেল। ডান হাতের সেই নরুনের মত তর্জনী দিয়ে বিজু ফুটো করল ডাবের মুখ। ফিনকি দিয়ে জল বেরোল। মন্টু খেল। আর একটা

সেই একইভাবে ছাড়িয়ে বিজু এবারে এগিয়ে দেয় তপুকে।

'তুই খা।' তপু বলে।

সারা দুপুর উত্তেজনায় ওরা ছটফট করে। তিনটে নাগাদ তপু টেম্পোটা নিয়ে আসে। আকাশে মেঘ। ছেঁড়া-ছেঁড়া অন্ধকার জমে আছে। রাস্তায় ভিড়। লোকজন ব্যস্ত। তপু অপারেশনের ছকটা বুঝিয়ে দেয়। ড্রাইভারের সীটে থাকবে তপু। পাশে মণ্টু। টেম্পোর ডালায় বস্তা নিয়ে বিজু। তপু গাড়ির জানলা থেকে মুখ বার করে বলবে, কারখানার মাল। গেট খুলবে। সঙ্গে সঙ্গে মণ্টু চলে যাবে টেম্পোর ডালায়। পর পর দুটো গ্রেনেড চার্জ করবে। দরকার না হলে কাউকে মারা নেই।

'কেলাতে এতো ভয় কেন ওস্তাদ?' মণ্টু জিজ্ঞেস করে।

তপু হাসে। বলে—'রক্তের অনেক দাম।' কথাটা মিলির মুখে শুনেছিল।

বিজু বলে—'ঠিক কথা। ব্ল্যাড ব্যাঙ্ক রক্ত কেনে।'

'একটা জিনিস মাথায় রাখবি—' তপু বোঝায়—'যেন গেটটা বন্ধ করতে না পারে। আমরা থাকব ঠিক দশ মিনিট। তার একচুল বেশি নয়। লাস্ট ফায়ার আমি করব। ফাঁকা আওয়াজ। শুনেই টেম্পোয় চাপবি। আমাদের গাড়িতে কমরেডদের কাউকে তুলব না। সেটা অন্য স্কোয়াডের দায়িত্ব।'

অরিন্দমের বাড়িতে গত রাতে যায় নি। খবর দিয়েছিল। আজ ফিরবে। বিকেল হলেই মাথাটা ভার হয়। শীত-শীত করে। কলকাতায় এই শেষ এ্যাকশান। তারপর মুক্ত-এলাকায় চলে যাবে। মিলির কি হবে! মিলিকে যদি সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়! কথাটা ভাবতেই বুক জমে যায়। মিলির এ ব্যাপারে জড়ানোর কোন সুযোগ নেই। এক ওই তারক। ও যদি বলে দেয়, তাহলে মিলি ধরা পড়বে। মিলির কি হবে। এই ভাবনাটা বিষ-পিঁপড়ের কামড় লাগায়। তারককে ঝেড়ে দিলে কেমন হয়। ইচ্ছেটা মাথায় গেঁথে

থাকে। ওই একটা লোক মিলিকে কাঁদাতে পারে। মিলিও আজ আসবে কমলের সঙ্গে দেখা করতে। তপুই বলেছে। ইন্টারভিউর দিন হঠাৎ না এলে সন্দেহ হবে। টেলিফোনে মিলির কান্নাটা ওর কানে বাজে। মিলি হঠাৎ কেন এত ভেঙ্গে পড়ল। কি এমন হয়েছে। অদ্ভুত এক ভয়ে তপুর মন সেই থেকে অসাড় হয়ে আছে। মিলিকে আর ফোন করার সাহস হয় নি। রমাও আজ যাবে। ও নিশ্চয়ই ঘোড়াটা প্রণবকে দিতে পেরেছে। এখনও পর্যন্ত কোন খবর বেরোয় নি। গণ্ডগোল হয় নি কিছু।

ঠিক পাঁচটার সময় টেম্পোটা জেল গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। গেটের দু-পাশে খাঁকি উর্দি পরা সি. আর. পি.। এ্যাটেনশন ভঙ্গী। হাতের রাইফেল চেন দিয়ে কোমরের বেল্টে বাঁধা। তপু চারপাশ দেখে নেয়। টিপ-টিপ বৃষ্টি। মেঘ আছে। হাওয়া নেই। মেন গেটের গায়ে একটা মানুষ যাওয়া আসার ছোট গেট। তালাচাবি লাগান। ডিউটি অফিসার সামনে খাতা নিয়ে বসে আছে। ভেতরের গেটের দরজার এক চিলতে খোলা। বন্দীরা ঢুকছে, বেরোচ্ছে। দু-চারজন ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে আছে। গল্প করছে। ও আর একবার টেম্পোর হর্ন বাজায়। এক গোছা চাবি হাতে সিপাইটা তাকায়। তপু বলে—'কারখানার মাল।'

এই সিপাইটাই বোধ হয় তারক। তার মুখ কেমন কালো হয়ে যায়। চাবির গোছা নিয়ে সে গেটে আসে। চাবি হাতড়াচ্ছে।

মন্টু চাপা গলায় বলে—'শালা, চাবি খুঁজে পাচ্ছে না।'

তপু বোঝে মন্টুর শরীর কাঁপছে। আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে। তালা খুলে তারক গেটটার একটা পাল্লা টেনে দেয়। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে টেম্পোটা ঢুকে পড়ে। তারক সরে দাঁড়ায়। হাতে চাবির গোছাটা কাঁপে। মন্টু দরজা খুলে নামে। এক লাফে ডালায় ওঠে। তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দ। তপুর কানে তালা লাগে। চাপ-চাপ কালো ধোঁয়ায় অন্ধকার নামে। আবার একটা গ্রেনেড ফাটে।

অফিসের মধ্যে হৈ-চৈ। ছুটোছুটির শব্দ। তপু দেখে জগদীশ ছুটে বেরিয়ে এলো। তার হাতে তপুর সেই পিস্তল। জগদীশের সঙ্গে লালবাজার লক-আপে দেখা হয়েছিল। রমা কাজ করেছে। তপু এক পলক মিলিকে দেখে। জগদীশের হাতের পিস্তল কেশর নাড়ে। তারকের বুকে লাগে। তারক মাটিতে পড়ে যায়। ভেতরের ছেলেরা দলবেঁধে ছুটে আসছে। সামনের গেট খোলা। জগদীশ হাতে পিস্তল নিয়ে চেঁচাচ্ছে—'বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে এসো।' তপু ঘড়ি দেখে। পাঁচ মিনিট। মণ্টু আর বিজু পেটো আর গ্রেনেড চালাচ্ছে। জেলের ভেতর পাগলা-ঘন্টি বাজছে একটানা। তপু টেম্পো থেকে নামে। অফিস ফাঁকা। শাদা পোশাকের পুলিশেরা পেচ্ছাপখানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করছে। টেবিলের তলায় কাঁপছে দুজন। জানলা দিয়ে ভেতরের পুকুর দেখা যায়। এক গলা জলে নেমে চারজন সিপাই বাঁশি বাজাচ্ছে। গ্রেনেডের শব্দ শুনলেই ডুব দিচ্ছে জলে। দু-হাতের তলায় ক্রাচ দিয়ে একজন বন্দী দাঁড়িয়েছিল। ক্রাচ ফেলে খোলা গেট ধরে সে চোঁ-চা দৌড় দেয়। তপু ঘড়ি দেখে, সাত মিনিট। ষ্টিয়ারিং-এ বসে। তারকের বুকে গুলি। চোখ উল্টে গেছে। উত্তেজনায় মণ্টু নেমে পড়েছে টেম্পো থেকে। তপু গাড়ি ব্যাক করে। মণ্টুকে ডাকে। রিভলভারে দু-বার ফাঁকা আওয়াজ করে। মণ্টু শোনে না। সামনের রাস্তা খালি। বন্দীরা রাস্তায় নেমেই কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। বালির বস্তার আড়ালে একজন সি. আর. পি.র রাইফেল গর্জায়। মণ্টুর পিঠে একটা গুলি লাগে। মণ্টু পড়ে যায়। রক্তে জামাটা লাল। রাইফেলের নল টেম্পোর দিকে ঘোরে। বিজু চেঁচায়—'মণ্টু, মণ্টু।' মণ্টু ওঠে না। গাড়ির ডালার পেছনে গুলি লাগে। গাড়িটা কেঁপে ওঠে। তপু গিয়ার পাল্টায়। তার হাতে যেন উচ্চৈঃশ্রবার লাগাম।

টেম্পোটাকে পার্ক সার্কাসের পুরনো কবরখানার মধ্যে রেখে ওরা নেমে যায়। বিজুর শরীর কাঁপছে। একটা কথা বার বার জিজ্ঞেস

করছে—'মণ্টু কি মারা গেল?' তপু জানে না। চুপ করে থাকে। ওর মাথায় তখনো পাগলা-ঘণ্টি, গ্রেনেডের বিকট শব্দ। তারকের গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। তারক মরেছে। মিলির আবছা মুখ। মিলির চোখের সামনে তারক গুলি খেয়েছে। বিজু তপুর হাত ধরে। বলে—'জ্বরে তোর গা পুড়ে যাচ্ছে।' দুটো ট্যাক্সি নিয়ে ওরা দু-দিকে চলে যায়। তপু বলে—'ক-দিন সাবধানে থাকিস।'

অরিন্দম অনেক আগেই বাড়ি ফিরেছে। ওর ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারে বিদেশী বাজনা বাজছে। ঘূর্ণি ঝড়ের সুর। তপু ঘরে ঢোকে। মাতালের মতো লাল চোখ। কিম্ভূত চেহারা।

অরিন্দম অবাক হয়। 'কি হয়েছে তোর?' তপুর কপালে হাত রাখে। 'ইস্, ভীষণ জ্বর।' বাজনা বন্ধ হয়। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। ঘরে ফিকে আলো। রেডিওতে খবর হচ্ছে। জেল ভাঙার খবর। অনেক বন্দী পালিয়েছে। সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায় নি। দুষ্কৃতকারীদের একজন মারা পড়েছে। একজন ওয়ার্ডার নিহত। জনা দশেক আহত। রাস্তায় কয়েকজন বন্দী ধরা পড়েছে। তদন্ত হচ্ছে।

অরিন্দম খবর শোনে। তপুর দিকে তাকায়। তপু বলে—'আমার বোধ হয় টি.বি. হয়েছে।'

দারুণ জ্বরে তপুর শরীর পুড়ে যায়। তিন দিন প্রায় অজ্ঞান, অসাড়। মাথার মধ্যে অহরহ পাগলা ঘণ্টা বাজে। গ্রেনেড, বোমা ফাটে। মনে হয়, চৌচির হয়ে যাবে মাথাটা? চারপাশে চাপ-চাপ কালো জমাট ধোঁয়া। বয়লারের চিমনি উড়ে গেছে যেন। কণ্ঠনলীতে গুলিবেঁধা তারক। চোখ উল্টে পড়ে আছে। তার তো মরার কথা ছিল না। আর মণ্টু! পাঁচটা গুলি খেয়ে হজম করেছিল। তার শরীরে মণ্টুর তাপ এখনো লেগে আছে। সেই বা হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়লো কেন? চোখ বুজে তপু রক্ত দেখে। চোখ খুলে রক্তে ভেসে যায়। ও চেঁচিয়ে ওঠে—'ও আমি চাই নি।'

তপু তাকায়। ঘোলাটে লাল চোখ। অরিন্দম ভয় পায়।

অরিন্দম ভয় পেয়েছিল। রোজকার খবর তার এই ভয়কে আরও বাড়ায়। হৃদপিণ্ডটা যেন সবসময় গলার কাছে আটকে থাকে। তপু ওর বন্ধু। তপুকে ও ভালবাসে। তাড়াতে পারে না। রাতে খারাপ স্বপ্ন, বিভীষিকা দেখে কেঁপে ওঠে। ঘেমে নেয়ে যায়। এক ডাক্তার বন্ধুকে বাড়িতে এনে তপুকে দেখিয়েছিল। ডাক্তার কিছু ওষুধ দিয়েছে। আড়ালে বলেছে—'কে হয় ?'

'বন্ধু।'

স্যানিটোরিয়ামে পাঠিয়ে দাও। অবস্থা খারাপ।'

তপু রোজ কাগজ দেখে। প্রায় চুয়ান্নজন পালিয়েছিল। চল্লিশজন ধরা পড়েছে। পুলিশ বলছে বাকিদের ধরতে আর দেরি নেই। বিজু ধরা পড়েছে। বরেনদা নিখোঁজ। বেঁচে আছে না মরে গেছে, কেউ জানে না। অরিন্দম টেলিফোনটা এই ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। শুধু এই কাগজের খবরটুকু সম্বল। তপু বোঝে, ভেতর থেকে একটা পোকা ওকে খেয়ে ফেলছে। সেই রাতে পালাবার দিন পোকাটা শরীরে ঢুকেছিল। তারপর ক্রমাগত কুরে-কুরে খাচ্ছে। এই পোকাটাকে ও বার বার টিপে মারতে চেয়েছে। পারে নি। এই পোকাটা ওর গোটা পৃথিবীটা খেয়ে নিয়েছে। ও বুঝতে পারে নি। বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে নাড়ীর বাঁধনকে ওই ছোট জীবটা কেমন দাপটের সঙ্গে গিলে নিয়েছে। আজ সে একা। ফাঁকা। মুক্ত-অঞ্চল নেই। গণফৌজ নেই। বরেনদা নেই। মিলির কথা মনে পড়ে। মিলি কেমন আছে ? আজ এক মাস হয়ে গেল। কমল পালিয়েছিল। আবার ধরা পড়েছে। এসব কাগজের খবর। মিলি। আমার মিলি। বালিশে মুখ চেপে ও বিড়বিড় করে।

অরিন্দম একদিন বললো—'চন্দ্রকোণার স্যানিটোরিয়ামে তোর

জায়গা হয়েছে। চমৎকার জায়গা। মেদিনীপুরের বর্ডার। লালমাটির জায়গা। চারপাশে ঘন শাল বন। দিনরাত কি শাঁই-শাঁই হাওয়া।'

তপু ফ্যাকাশে মুখে ওর কথা শোনে।

'তিন মাসের মধ্যে সেরে যাবি।' অরিন্দম বলে—'কেউ তোকে চিনবে না। অন্য নামে বেড বুক করেছি।'

বাইরে তখনো অন্ধকার নামে নি। সামান্য কুয়াশা। ধোঁয়া ছড়িয়ে আছে।

'কবে যেতে হবে?' তপু জিজ্ঞেস করে।

'কালই চল।'

তপু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে—'যাবো। একটু ঘুরে আসি।'

অরিন্দম আটকায়—'এই শরীরে হাঁটা-চলা না করাই ভালো।'

'আর হয়তো ফিরবো না।' তপু বলে—'একটু ঘুরে আসি।'

প্রায় দেড় মাস বাদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তপুর পা টলে। মাথা ঘোরে। চোখে ঝাপসা দেখে। অরিন্দম টাকা দিয়েছিল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিলির কাছে যায়। মিলিদের বাড়ি খালি। কেউ নেই।

বাড়ির পুরোনো কাজের লোক হরিদা। তপুকে চেনে। বলে, 'ওনারা মধুপুর গেছেন।'

'হঠাৎ কি হলো?'

'দিদির শরীর খারাপ। মাথা ঘোরে। বমি হয়। খেতে পারে না কিছু।'

তপু একটা প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খায়। গোটা শরীর ঝনঝন করে। গুঁড়িয়ে যায়। হরিদার দিকে তাকায়। ওর চোখ দেখে হরিদা ভয় পায়। দুটো শক্ত হাতে তার কাঁধ চেপে ধরে। ঝাঁকুনি দেয়। চিৎকার করে—'কে করেছে?' হরিদা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। তারপর কেঁদে ফেলে। আরো কড়া হাতে তপু ওকে ঝাঁকায়। বলে—'আমি জানি। আমি জানি।' অনেকদূর থেকে মিলির গলা বাজে—'তপু, আমি মরে গেছি।' তপুর শরীরে ঘাম আর আগুন

ছোটে। বাইরে অন্ধকার। আকাশে দু-একটা তারা। ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম যায়। তপুর খেয়াল নেই। হাজার হাজার চোখ তাকে খুঁজছে। কয়েকশো বারুদঠাসা ঘোড়া তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উসখুস করছে। ও আবার একটা ট্যাক্সি নেয়। বলে—'রেড্ রোড।' ট্যাক্সি চলে। রেড্ রোড, গঙ্গার ধার, ইডেন গার্ডেনস। আবার রেড রোড, ভিক্টোরিয়া, লেক। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে।

তপু ভাবে মানুষ রক্ত চায় না। যুদ্ধ চায় না। মানুষ বাঁচতে চায়। মোটামুটি সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেই হলো। আর চাই শান্তি। খুব মামুলি ছোটোখাটো স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বাঁচে। বাঁচতে ভালোবাসে। সেখানেও মার খায়। কোণঠাসা হয়ে যায়। পেছোবার জায়গা থাকে না। দিশাহারা মানুষ পথ খোঁজে। ইতিহাস সংকেত দেয়। চোখে জল নিয়ে মানুষ হাতিয়ার ধরে। নিজের রক্তমাখা হাত দেখে সে কাঁদে। মরে আর মেরে কাঁদে। সবই করে ইতিহাসের চাপে। মানুষেয় ঘাড়ে জবরদস্তি কিছু চাপানো যায় না। হিংসা, কিংবা অহিংসা কোনটাই নয়।

মিলির শরীরের সেই হাল্কা মিষ্টি গন্ধটা ওর নাকে লাগে। গোটা কলকাতা জুড়ে মিলি যেন ছড়িয়ে গেছে তার গন্ধ। ও ভাবে, আমি কি পালিয়ে যাবো? পালাবার দুটো মোক্ষম পথ আছে। পাগল অথবা সাধু সাজা। সকলে বলবে—আহা, হায় হায়। কিন্তু আমি কেন পালাবো? ভুল করেছি? মানুষ তো ভুল করে। মানুষ কাজ করে। মানুষ তাই ভুলও করে। মানুষ ভুল শোধরায়। আমিও শোধরাবো। আমি পালাবো না।

বসন্তদার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছাড়ে। ভাড়া মেটায়। দোতলায় বসন্তদার ঘরে ঢোকে। অন্ধকারে বসন্তদা বসে আছে। চোখে চশমা নেই।

'বসন্তদা!' ও ডাকে।

'কে?'

'আমি তপু।'

'তপু? বসন্তদা সরস গলায় ওর নামটা উচ্চারণ করে।

তপু বলে—'বসন্তদা, আপনার বেহালাটা একটু বাজাবেন। আমি শুনবো।'

অন্ধকার ফাঁকা ঘরে ওর গলা ছড়িয়ে পড়ে।

'তুমি তো আমার বেহালা ভেঙে দিয়েছো তপু।' বসন্তদা জানায়—'এখনো আর একটা জোটে নি।'

তারপর বুকের কাছে কি এক কান্না উথলে ওঠে। ও বলে, 'একটা নতুন বেহালা কিনুন।'

বসন্তদা তাকিয়ে থাকে। তপু দাঁড়ায় না। রাস্তায় লোকজন কম। ঠাণ্ডা হাওয়া। তপু দেশপ্রিয় পার্কের মাঝখানে ঘাসের ওপর বসে। ভিজে ঘাস। ও উপুড় হয়ে শোয়। ঘাসের গন্ধ ওর নাকে লাগে। মুখ, চোখ শিশিরে ভিজে যায়। ও বুক ভরে সেই গন্ধ নেয়। ঘাসের গন্ধ। মিলির গন্ধ। মাটিতে মুখ গুঁজে ও বলে—'কথা দিচ্ছি, আমি আর পালাবো না।'